মুসাফের-প্রিয়া

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ১৷০ মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি

রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়

৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপঞ্চমী

১লা ফাল্গুন ১৩২৭

প্রিণ্টার—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে

মেট্‌কাফ প্রেস—

৭৯ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

আমার ————————————————

———————————— কে

মুসাফের-প্রিয়া উপহার দিলাম।

ইতি শ্রী ————————————

তারিখ ————————

উৎসর্গ

এমনই এক চূত-মুকুলের নব-মুঞ্জরণের দিনে অত্যন্ত

অপ্রত্যাশিতভাবে যাহার গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া-

ছিলাম আর তেমনই অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিয়া-

ছিলাম—অথচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলাম বলিয়া

মনে হয় না, সেই আমার অন্তর-বনের

বিজন-বালার কমনীয় করোদ্দেশ্যে

এই বিজন-বালা রাজনন্দিনীর

কাহিনী অর্পন করিলাম।

ইতি—

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৯ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

নূতন মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাস

ভিখারিণী শৈল

ভাষায় ভাবে, গল্প-মাধুর্য্যে পাঠক-পাঠিকা বিগলিত হইবেন—মুগ্ধ হইবেন—অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না—আর একবার প ড়লে এই ভিখারিণীকেও ভুলিতে পারিবেন না।

মূল্য ৳৹ মাত্র।

ভীমসিংহ

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

রাজপুতের ইতিহাস—রাজপুত্রের ইতিহাস নাটকের মধ্যে কি ভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে দেখুন। মূল্য ৳৹ মাত্র।

রতনেরতন

সামাজিক প্রহসন—প্রেসিডেন্সী থিয়েটারে অভিনীত।

মূল্য ।৹ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ও রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়।

৬১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মুসাফের-প্রিয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আলাউদ্দিন যেদিন শাণিত ছুরিকার বলে বৃদ্ধ খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, এবং করিয়াই বিদ্রোহীদের শাসন করিবার জন্য সমর সজ্জায় সাজিতে প্রস্তুত হইলেন—ঠিক সেই সময়েই সুদূর পারস্য প্রদেশ হইতে সৈনিকের ব্রত লইয়া মহম্মদ ভারতবর্ষ যাত্রা করিল।

কৈশোরে যখন তাহারা দুইভাই ইরফান ও মহম্মদ নদীতীরের সরু পথটি ধরিয়া ফুলের গুচ্ছ চয়ন করিয়া লতাপাতা ছিঁড়িয়া স্কুল হইতে বাটী ফিরিত—সেই সময়েই একদিন তাহাদের পিতা

ইহ সংসার হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যান। বিধবা জননীর আশ্রয়ে সুখে দুঃখে তাহাদের দিনগুলা একরূপ নির্ভাবনায় চলিয়া যাইতেছিল—কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর বছর পাঁচেকের মধ্যেই তিনিও যেদিন পরলোকে চলিয়া গেলেন—সেদিন ইরফান মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিল। মহম্মদ তখনও বালক।

তারপরও দীর্ঘ আটটি বৎসর তাহারা দুই ভাই সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জীবনের শত-শত ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর লোকের মতই সংসারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু নিয়তি অত্যন্ত অকালে ইরফানকে আহ্বান করিল, আর সে অনেক ভুগিয়া শেষে অত্যন্ত অসময়ে স্বাস্থ্যকে সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে ভাইয়ের নিকট বিদায় লইয়া যেদিন বোগদাদ চলিয়া গেল, সেদিন তাহার জীবনী শক্তি একেবারেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। আর বেচারা রোগ যন্ত্রনার হাত হইতে মুক্তি লইতে গিয়া যেদিন বোগদাদে আসিয়া পৌছিল, তাহার কিছুদিন পরেই নিয়তি তাহার সকল যন্ত্রণা ঘুচাইয়া দিল।

ভ্রাতার মৃত্যুর পর সে যেদিন সংসারে নিতান্তই নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িল—আর চারিদিক হইতেই অপূর্ণতা ও অতৃপ্তি আসিয়া তাহাকে শুধু দূরেই ঠেলিতে লাগিল—সেদিন তাহার জীবনটাকে হাস্যময় উৎসবময় করিয়া তুলিবার কোন

২

কূলকিনারাই না পাইয়া সে তাহার জীবন তরী ভাসাইয়া দিল ভারতবর্ষের দিকে। কারণ এই দেশটার বিদ্রোহ-অগ্নি আর রাজরক্তের ছড়াছড়ি তখন বোধ হয় সমস্ত দেশেরই রাজনৈতিক পঙ্কিলতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। আর তাহা পৃথিবীর কোন সভ্যদেশেই অজানিত ছিল না।

কিন্তু ভারতবর্ষে আসিলে তাহার জীবনটা যে হাস্যময় উৎসবময় হইয়া উঠিবে না তাহা যেমন তাহার অন্তরের কাছে অপরিচিত ছিল না, সেটা যে এতবড় রহস্যময় হইয়া উঠিবে তাহাও তখন মহম্মদের মোটেই জানা ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু ঠিক ভারতবর্ষ প্রবেশ মুখেই সে যখন একটা পার্ব্বত্য পথে আসিয়া পড়িল, আর ক্লান্ত অশ্বকে একটা গাছে বাঁধিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য বৃক্ষতলে বসিল, তখন কোথা হইতে শন্ শন্ শব্দে একটা তীর আসিয়া তাহার কাণের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়া সম্মুখের বনটাতে পড়িল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু এই তীর কাহার উদ্দেশ্যে কি উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, তাহা ভাবিতে গিয়াও তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মহম্মদ নিরস্ত্র ছিল না; কিন্তু অদৃষ্ট শত্রুকে সে কিরূপেই বা প্রহার করিবে এবং এই অপরিচিত দেশে নির্জ্জন পথে তাহাকে যদি কেহ দলবদ্ধ ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই বা সে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে তাহাও সে ভাবিয়া পাইতে ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তীরটা যে জন্যই নিক্ষিপ্ত হউক, তাহা যে কাহাকেও বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহা মহম্মদ তখনই প্রথম বুঝিতে পারিল, যখন তাহার বিস্মিত অন্তরকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া দিয়া এক সুন্দরী তরুণী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "মুসাফের তুমি পথ হারাইয়াছ—বিলম্ব করিও না পলাও।" বলিয়াই নিজের পা হইতে বিদ্ধতীরটা টানিয়া খুলিল।

কিন্তু মুসাফের পলাইবে কি? শত্রুর গুপ্ত অস্ত্র দেখিয়া সে যতখানি ভীত বা বিস্মিত না হইয়াছিল তাহার চতুর্গুণ বিস্মিত হইল, এই নির্জ্জন অরণ্যে এই সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া ও তাহার করুণাপূর্ণ নিষেধবাণী শুনিয়া। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া এই তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন এই সুন্দরীর ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল শোণিত ধারা ছুটিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া তাহার ক্ষতস্থানটা বাঁধিয়া দিতে গেল। কিন্তু সুন্দরী তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল• "পথিক! আমার জন্য বিচলিত হইও না। যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, পলাও।"

"প্রাণের ভয় থাকিলে এই দূর দেশে আসিতাম না। কিন্তু এই নির্জ্জন অরণ্যে কল্যাণময়ী করুণাময়ী তুমি কে, না জানিয়া এক পদও নড়িতেছি না।"

"আমার পরিচয়ের জন্য ব্যস্ত হইও না। শত্রুদল এখনই আসিয়া পড়িবে, শীঘ্র তোমার ঘোড়া খুলিয়া চলিয়া যাও। ক্রোশখানেক সম্মুখে গিয়াই নদীতীরে একটী ভগ্ন কুটীর দেখিতে পাইবে, সেইখানে অপেক্ষা করিও; আমার সঙ্গে দেখা হইবে।" বলিয়া সেই তরুণী অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে শত্রুদলও ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহাদের অশ্বক্ষুর পর্ব্বত গাত্রে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছিল। মহম্মদ বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া অশ্বারোহণে অগ্রসর হইল এবং শীঘ্রই বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না যে, এতদিন শ্যামশস্পের শোভা দেখিয়া নদীর কলধ্বনি আর পাখীর সঙ্গীতে গলা মিলাইয়া, শান্ত শিষ্ট ভাবে তাহার যে জীবনটা চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া আজ বিংশতি বৎসর বয়সে এই অপরিচিত দেশে অপরিচিত জন মণ্ডলীর মাঝখানে আসিয়া সে যে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চলিল, তাহার শেষই বা কোথায় এবং প্রয়োজনই বা কি ছিল? সেত' দেশে বসিয়া যা' ধ্রুব যা' নিশ্চিত, তাহার মধ্যেই আপনার সত্তাকে নিত্য নূতন করিয়া, অনুভব করিয়া আস্বাদ করিয়া জীবনটা তাহার একরূপ কাটাইয়া দিতেই পারিত। তাহার বাল্য কৈশোরের সুখ শান্তির মধ্যে কোথায় অপূর্ণতা ছিল, যাহার জন্য এই নবযৌবনে সে সৈনিকের কঠোর ব্রত লইয়া জীবনটাকে শুধু বিসর্জ্জন দিবার জন্যই এই

দূর দেশে আসিয়া পড়িল। তাহার স্বচ্ছ সরল হাস্যময় জীবনটা যে আজ গাঢ় রহস্যময় হইয়া উঠিতে চলিল, তাহাত' সে বার-বার না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু তাহার এই সরল শান্তিপ্রিয় জীবনের মধ্যে একটা মস্ত বড় অপূর্ণতা যে নিরন্তর খোঁচা মারিয়া তাহার অক্ষুণ্ণ শান্তিকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল তাহাত' সে মনে প্রাণে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে নাই। নহিলে নিতান্ত নিঃসঙ্গ হইয়াও মহম্মদ হয়ত' তাহার জীবনটাকে বেশ স্বচ্ছন্দেই চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিত। কারণ তাহার জীবন যাত্রা এত বেশী আড়ম্বর-বিহীন, আর সে নিজের প্রতি এত উদাসীন ছিল, যে নিজেই রথী নিজেই সারথি হইয়া যুদ্ধ করিয়াই হউক কি শান্তি রক্ষা করিয়াই হউক জীবনের পথটা সে অনায়াসেই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু অকস্মাৎ মধ্য পথে একটা মস্ত বড় বাধা আসিয়া সমস্তটাই গোলমাল করিয়া দিল।

কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, এমনই সময়ে একদিন অপরাহ্নে সে স্কুল হইতে বাটী ফিরিতেছিল—পথে নদীটা যেখানে ঘাড় বেঁকাইয়া তাহাদের প্রতিবাসী কৃষক মুরুদ্দিনের বাগান বাড়ীর কোলে আসিয়া মিশিয়াছে, সেইখানটায় আসিতেই সহসা ফুলের বাগানটার দিকে মহম্মদের দৃষ্টি পড়িল।

দেখিল, আবক্ষ উন্নত পুষ্প বৃক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুরুদ্দিনের কন্যা রোশেনা পুষ্পচয়ন করিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান কিরণ রশ্মি তাহার ঈষৎ স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছের উপর পড়িয়া তাহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে, আর তাহার আরক্ত গণ্ডের উপর সূর্য্যের রক্ত কিরণছটাই হৌক কি ফুলের রক্ত আভাই হউক যে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে তাহা চক্ষে না দেখিলে অনুভব করিবার মত শক্তি কাহারও নাই। মহম্মদ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এই রোশেনাকে সে আরও কতবার দেখিয়াছে, খেলা করিয়াছে, ভাল বাসিয়াছে; কিন্তু ঠিক এমনই ভঙ্গিমায় এতখানি রূপ লইয়া শুধু তাহাকে কেন আর কাহাকেও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হইল না।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে মহম্মদ যখন দূরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ হইতেছিল, অভিভূত হইতেছিল, তখন রোশেনা তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কিন্তু মহম্মদ যখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল তখন রোশেনা শিস দিয়া তাহাকে ডাকিল, আর সে কাছে আসিতেই বলিল "ফুলের উপর তোমার এত লোভ মহম্মদ, এই নাও" বলিয়া একগুচ্ছ ফুল তাহার হাতে দিল। ফুল হাতে করিয়াই মহম্মদ বলিয়া উঠিল "রোশেনা, তুমি বড় সুন্দর।"

"ইস্" বলিয়া হস্তস্থিত ফুলের গুচ্ছটা দিয়া মহম্মদের মুখের উপর একটা ঝাপটা মারিয়া রোশেনা ছুটিয়া পলাইল।

আর মহম্মদ, সেইখানে সেই কুসুম কুঞ্জের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হস্তস্থিত ফুলের গুচ্ছটা বক্ষে মুখে বারংবার স্পর্শ করাইয়া পুষ্পগুচ্ছেরই আদর করিতে লাগিল কি যে হাতটা তাহাদিগকে চয়ন করিয়াছিল, তাহাকেই উদ্দেশ্যে চুম্বন করিতে লাগিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন হইতেই নিত্য প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সে তাহার প্রেমের বরণ ডালা লইয়া রোশেনার কাছে আসিত। আর প্রণয়-পাত্রীর আবাহনে বা অবহেলায় কখনও হাসিত, কখনও বা কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইত।

এইরূপেই তাহার কৈশোর প্রেমের স্বচ্ছন্দ দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছিল এবং আরও দিন কতক বোধ হয় কাটিয়াই যাইত।

কিন্তু এই সময়েই একদিন রোশেনার খুড়তুত ভাই হামিদ তাহাদের বাটীতে আসিল আর আসিয়াই মহম্মদের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিয়া বসিল, নিজের পৌরুষের গর্ব্বেই কি রেশেনার নারী-হৃদয়ের জাতিগত চাঞ্চল্যের সুযোগ পাইয়া, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু তাহা সে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, মহম্মদের আহত অন্তরটা যে এই সময় অভিমানভরে কয়েকদিন একেবারেই দর্শন দিতে চাহিলনা, সেইটাই বোধ হয় তাঁহার পরাজয়ের প্রথম সূচনা রচনা করিয়া দিল।

কারণ কয়েকদিন পরে যখন সে অভিমানকে পদদলিত করিয়াই রোশেনার বাগান বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রোশেনার কাছ হইতে কে যে ত্রস্ত হইয়া গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটিয়া পলাইল, তাহা দেখিতে না পাইলেও মহম্মদের বুঝিতে বাকী রহিল না। সে সেইখান হইতেই ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেই সময়েই রোশেনা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "মহম্মদ, যেওনা।"

স্তব্ধ হইয়া মহম্মদ তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিল, তাহার পরও মহম্মদ কিরূপেই বা সেখানে অবস্থান করিবে তাহাও যেমন তাহার ধারণায় আসিতেছিল না রোশেনা যে কি উদ্দেশ্য লইয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ করিল, তাহাও তাহার নিকট তেমনই অবোধ্য রহিয়া গেল। সে বিস্মিত নেত্রে রোশেনার মুখের দিকে চাহিয়া শুধু আদেশ পালন করিবার জন্যই দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিল "কি ব'লবে রোশেনা?"

প্রথমটা সে কিছুই বলিতে পারিলনা। ঘাড় হেঁট করিয়া পায়ে করিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল, তারপর সহসা বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার একটু উপকার ক'র্ব্বে মহম্মদ ?"

মহম্মদ একটু হাসিল। হাসিয়া বলিল "দুদিন হামিদকে পেয়েই কি ভুলে গেছ রোশেনা, যে মহম্মদের কাছে তুমি কতখানি—আর সে তোমার জন্য কতটা ক'র্ত্তে পারে ?

রোশেনা আবার ঘাড় হেঁট করিল—কিছু বলিল না।

অনেকক্ষণ তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিয়া মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিল "রোশেনা, তুমি হামিদকে ভাল বেসেছ ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া রোশেনা বোধ হয় প্রাণের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল "সে তা'র মনের কথাটা খুলে ব'লতে চায়—কিন্তু বাবা এসে প্রত্যহই বাধা দেন—তুমি যদি একটু উপকার কর্ত্তে পার—"

"এইটুকু" বলিয়া মহম্মদ, বৃদ্ধ নুরুদ্দিনের কাছে চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় তাহার চক্ষু দুইটা যে পরিমাণে সজল হইয়া উঠিতেছিল, আর প্রাণপণে তাহা রোধ করিতে তাহার যে কতখানি শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছিল—তাহা শুধু তাহার অন্তর্যামীই জানিলেন।

তারপর সে যখন তাহারই প্রণয়-পাত্রী রোশেনার, আর

একজনের সহিত প্রেমালাপকে বাধা শুন্য, সঙ্কোচ শুন্য করিয়া দিবার জন্য মুরুদ্দিনকে ডাকিয়া লইয়া তাহার বাগান দেখিতে গেল, তখন তাহার অন্তরে প্রতি মুহূর্ত্তে যে নিঃশব্দ বজ্রাঘাত হইতেছিল—তাহা রোশেনা বুঝিল কিনা বলিতে পারি না—কিন্তু মুরুদ্দিন কিছুই বুঝিলনা। সে নিজের অভ্যাস মত শুধু বকিয়াই যাইতে লাগিল, শ্রোতা তাহাতে কর্ণপাত করুক আর নাই করুক। কোন্ গাছটি তাহার পরলোকগতা পত্নীর স্বহস্তে রোপিত—কোন্‌টা তাহার শ্বশুর তাহাকে উপহার দিয়াছিল—কোন্‌টা আনিতে তাহাকে আরব দেশে বা ইটালীতে ছুটিতে হইয়াছিল, এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীকে যথাসম্ভব দীর্ঘ ও অতিরঞ্জিত করিয়া সে বারংবার বলিতে ছাড়িল না যে, এই উদ্যান তৈয়ারী করিতে তাহাকে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাহার প্রতিষ্ঠাতাকে তত কষ্ট পাইতে হয় নাই—এবং সে যদি মানুষ না হইয়া কোনরূপে দেবতা হইতে পারিত, তাহা হইলে এই উদ্যানের বৃক্ষে বৃক্ষে সে সোনার ফুল ও হীরার ফল ঝুলাইয়া বেহেস্তের সমস্ত সৌন্দর্য্যকেই পরাভূত করিয়া দিত। কিন্তু আল্লা তাহাকে চিরদিন মানুষই রাখিয়া দিলেন, তাই এ জন্মের মত তাহার সাধ অপূর্ণই থাকিয়া গেল। নহিলে—

নুরুদ্দিন ছিল সেই ধরণের লোক, যে কাহাকেও শ্রোতা রূপে পাইলেই প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয়, সম্ভব বা অসম্ভব তাহার ভাণ্ডারে যাহা কিছু আছে সমস্তই এক নিঃশ্বাসে বলিয়া যাইতে চাহিত, শ্রোতা তাহাতে কর্ণপাত করুক বা না করুক, বিশ্বাস স্থাপন করুক আর নাই করুক, তাহাতে তাহার কিছুই বাধিত না। সে শুধু আপনার বক্তব্য বলিয়াই পরম সন্তোষ লাভ করিত। তাই সেদিন যখন সে মহম্মদের মত শ্রোতা পাইল, তখন তাহার বলিবার উৎসাহেরও যেমন শেষ হইতে ছিল না, বক্তব্যেরও তেমনই আদি অন্ত ছিল না। বাগানের জন্ম ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংশের ভবিষ্যৎ কাহিনীও সে যখন অনুমান করিয়া বলিয়া ফেলিল তখন আর বলিবার মত কিছুই না পাইয়া তাহার পিতামহ কবে কোন্ যুদ্ধে গিয়া শত্রুকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত না করিয়া শুদ্ধ একটী মুষ্ট্যাঘাতেই শোয়াইয়া দিয়াছিল, এবং কিরূপেই বা সেই শত্রু তখনই উঠিয়া ভীরুর মত একটী মাত্র অস্ত্রাঘাতেই তাহার পিতামহের যুদ্ধ লীলা সাঙ্গ করিয়া দিয়াছিল, নহিলে তিনিই যে একদিন এই পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাট না হউন, সেনাপতি হইতে পারিতেন তাহা নুরুদ্দিনের পিতামহের মৃত্যুর প্রায় এক শত বৎসর পরেও তাহার পৌত্র আজও কিরূপ

বিশ্বাস করে, তাহাই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু তাহার পিতামহের কাল্পনিক বীরত্বের উপাখ্যান শুনিবার কোন আগ্রহ ছিল না বলিয়াই হউক, কিম্বা তাঁহার দিবসের মেয়াদ ফুরাইয়া ছিল বলিয়াই হউক, সূর্য্যদেব যখন অস্তের দিকে পা বাড়াইলেন, তখন মহম্মদ উঠিয়া পড়িল। আর বৃদ্ধ নুরুদ্দিন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তেমনই অনর্গল বকিতে বকিতে দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া যখন মহম্মদের নিকট হইতে বিদায় লইল, তখন মহম্মদ একবার দূরে—যেখানে রোশেনা বসিয়াছিল সেই দিকে তাকাইল। কিন্তু সেই একটী মাত্র দৃষ্টিতেই রোশেনার প্রফুল্ল মুখ কি জানি কেন সহসা অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল।

বোধ হয় সে তখন ভাবিতেছিল যে, মহম্মদের অনুগ্রহে সে আজ যে সুযোগ পাইয়াছিল তাহাতে প্রেমের দিক দিয়া যতখানি জয় লাভই তাহার হইয়া থাক, মনুষ্যত্বের যে পরাজয় হইয়া গেল, তাহাতে তাহার আর মাথা তুলিবার কোন সামর্থ্যই রহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তারপর একবৎসর আর মহম্মদ রোশেনার সঙ্গে সাক্ষাৎই করে নাই—বোধ হয় তাহার নামও করে নাই। সে লেখা পড়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া সেই যে বাটীতে আসিয়া বসিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাহার জীবনটা সম্পূর্ণ অন্যপথ ধরিয়া বোধ হয় বন্য পথেই চলিয়া গেল।

কারণ তখন হইতেই স্তব্ধ মধ্যাহ্নে, দূরে নির্জ্জন নদীতটে বসিয়া সে যে কি ভাবিত, কিম্বা আদৌ ভাবিত কিনা তাহাও সে নির্ণয় করিয়া বলিতে পারিতনা, জীবনটা তাহার এমনই ছন্নছাড়া এমনই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল।

কিন্তু এইরূপেই কিছুদিন চলিয়া যাওয়ার পর সহসা সেদিন যখন সে শুনিল যে, কাল হামিদের সঙ্গে রোশেনার বিবাহ হইবে এবং বিবাহের পরেই সে রোশেনাকে লইয়া

১৭

নিজ গৃহে চলিয়া যাইবে, সেদিন সমস্ত দিন সে যে কোথায় বসিয়াছিল—কি যে করিয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে যখন বরাবর আসিয়া নিজের শয্যাশ্রয় করিল এবং কি হইয়াছে বা কোথায় গিয়াছিল প্রশ্ন করায় শুধু বলিল যে, সে বড়ই হারিয়া গিয়াছে এবং কখনই আর জয় করিতে পারিবে না—বলিয়া বারংবার বক্ষে হাত দিয়া কিসের ইঙ্গিত করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে শুধু প্রচণ্ড জ্বর নয় সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিকার আসিয়াও তাহার দেহে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, এবং শীঘ্র চিকিৎসা না হইলে তাহার আর যে কোন পরাজয়ই হইয়া থাকুক, জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকিবার মত জয়-গৌরব যে মহম্মদের করায়ত্ত কিছুতেই হইবে না-তাহা সেদিন আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

কিন্তু সেই অর্দ্ধ সচেতন তন্দ্রার ঘোরে—সেই জীবন ও মৃত্যুর আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মহম্মদের জীবনীশক্তি যখন অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, আর অসংযত কল্পনার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলা যখন তাহার কর্ণে কাহার বিবাহোৎসবের মৃদুগম্ভীর বাদ্যধ্বনি কাহার কম্পিত চরণ যুগলের মৃদুমঞ্জীর সিঞ্জন ভাসাইয়া আনিয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটকে অধিকতর উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছিল,

ঠিক তখনই যে কাহার হস্তের কোমল শীতল স্পর্শ তাহার উত্তপ্ত ললাটে মুখে বয়োরা গোলাপের সৌরভ ছড়াইয়া সকল শ্রান্তি—সকল ক্লান্তি দূর করিয়া অন্তরে বাহিরে যে আগা গোড়া ভ্রান্তির জাল রচনা করিয়া দিত, তাহা মহম্মদের নিকট সেইদিন স্পষ্ট হইয়া উঠিল, যেদিন সে প্রথম নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল—যে তাহার রোগ শয্যার পাশে বসিয়া তাহারই মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রোশেনা বসিয়া আছে।

কিন্তু এমনটা কেন হইল, কেমন করিয়া হইল, মহম্মদ তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে তাহা ধারণা করিতে পারিতেছিল না। যেন সে আজ যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহা স্বপ্নও নয়, সত্যও নয়, জীবনও নয় মৃত্যুও নয়, নিদ্রাও নয় জাগরণও নয়। যেন সে এমন একটা কিছু, যাহা সে সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে অথচ আশা করিতে পারে নাই। যাহা তাহার অন্তর, অন্তর হইতে কতবারই না প্রার্থনা করিয়াছে অথচ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

মহম্মদকে পৃথিবীতে স্নেহ করিবার কেহ নাই। তাহার ভাই পর্য্যন্ত রোগকাতর দেহ লইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে—তাহার সম্মুখে পশ্চাতে শুধু অনন্ত অসীম পৃথ্বী—আর নিকটেও দূরে তাহার আপনার বলিতে শুধু সে। তবুও তাহার মনে এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতেছিল, যে রোশেনা আজ তাহাকে যে দয়া

করিতে আসিয়াছে তাহা তাহার স্নেহ বা প্রেম নয়; শুধু উলঙ্গ অনাবৃত দয়া—যাহার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক নাই, শুধু সহানুভূতির দাক্ষিণ্য জড়ানো আছে; এ কথা না বলিয়া দিলেও মহম্মদ অন্তরে অন্তরে বুঝিতে ছিল। তাই তাহার মনে হইতেছিল যে, আজ এ দয়া না করিলেই ভাল হইত; সে ত' তাহার নিঃস্বতা সহায়-হীনতা লইয়াই পরম শান্তিতে ছিল, তাহাতে যদি তাহার মৃত্যুও হইত, তাহাতেই বা ক্ষতি ছিল কাহার? কিন্তু আজ তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে টানিয়া লইয়া আসিবার জন্য রোশেনা যে পরিশ্রম করিয়া তাহাকে ঋণী করিয়া রাখিল, এ ঋণ শোধ দিবার মত অবস্থা ও অবসর তাহার কোথায়? এ যাত্রা যদি সে বাঁচিয়াই যায়—তাহা হইলেও তাহার বাঞ্ছিত সমাধি লাভের জন্য তাহার আর এখানে বসিয়া থাকা চলিবে না, যেমন করিয়াই হউক—যত মূল্যেই হউক তাহাকে দূরে যাইতে হইবে। এখানকার এই পরাজয় লইয়া নিরন্তর পরাজয়ের অপমান অনুভব করিবার জন্য সে পড়িয়া থাকিবে না। কোথায় থাকিবে তাহা মহম্মদের জানা ছিল না বটে, তবে এখানে যে নয় তাহা সে ভাল রূপেই জানিত।

তাই সেদিন রোশেনার মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "রোশেনা তুমি কবে এসেছ?" রোশেনা শুধু মৃদুস্বরে বলিল "সে অনেক দিন, কিন্তু তুমি ঘুমোও।"

তবুও মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিল "আমার কতদিন অসুখ ক'রেছে রোশেনা ?"

'একুশ দিন।'

"এই এতদিন ? হামিদ তোমাকে আস্‌তে দিলে যে ?"

রোশেনা যেন একটা মহা অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিয়া উঠিল "চুপকর মহম্মদ" বলিয়া তাহার কপালে হাত দিল।

আর মহম্মদ সুবোধ শিশুর মত চক্ষু মুদিত করিল। কিন্তু তবুও সেদিন পদ্মপত্র-বিগলিত শিশির বিন্দুর মত অশ্রু বিন্দু তাহার চোখ দিয়া কেন ঝরিতে লাগিল—তাহা রোশেনাও' বুঝিতে পারিলই না, মহম্মদ নিজেও তাহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বোধ হয় সে তখন ভাবিতেছিল—বহুদিন পূর্ব্বে এমনই এক স্তব্ধ অপরাহ্নে পিতাকে লুকাইয়া রোশেনা মহম্মদের সহিত নৌকা করিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। বাটী হইতে দূরে গিয়া নদীর যেখানটায় খুব বেশী স্রোত, সেইখানে গিয়া বোধ হয় মহম্মদের পুণঃ পুণঃ চুম্বনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই দূরে সরিয়া বসিতে গিয়া তাহার ওড়না খানা জলে পড়িয়া গিয়াছিল, আর মহম্মদ তাড়াতাড়ি সেটা তুলিয়া আনিতে গিয়া যে পরিমান জল খাইয়া ফেলিয়াছিল—তাহাতে মহম্মদের মত শক্তিমান না হইলে বোধ হয় ওড়ণার সঙ্গে তাহাকেও জলতলে প্রবেশ করিতে হইত।

সেদিন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া সে যখন ওড়ণা উদ্ধার করিয়া আনিয়া নৌকার উপরেই অবশ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, সেদিনও

রোশেনা এমনই করিয়াই তাহার ললাটে হাত দিয়াছিল, এমনই করিয়াই তাহার সেবা করিয়াছিল।

কিন্তু সেদিন মহম্মদের হৃদয়ে আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল জয়ের গৌরবে হৃদয় পূর্ণ ছিল; সেদিন সমস্ত পৃথিবী তাহার চক্ষে পুষ্পময় সঙ্গীতময় স্মৃতির সৌরভময় ছিল। আর আজ তাহার আশা নাই আকাঙ্ক্ষা আছে, জয়ের গৌরব নাই পরাজয়ের দাহ আছে, সৌরভ নাই স্মৃতি আছে, জীবন নাই দেহ আছে। আর তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান আছে সে?

সেদিনও সে যদি মরিত, তাহা হইলেও সে সুখী হইত, আজ মরিলেও সুখী হয়; কিন্তু সেদিনকার মৃত্যু জয়ের গৌরব লইয়া আজিকার মৃত্যু পরাজয়ের স্মৃতি বক্ষে বহিয়া।

কিন্তু তবুও তাহার মনে হইতে ছিল যে, এই যদি সত্য হইত, এইরূপেই যদি মৃত্যু হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষাই থাকিত না—পরাজয়ের কোন গ্লানিই তাহার জীবন স্মৃতিকে কলঙ্কিত করিতে পারিত না। আর, আর কিছু না হউক, রোশেনাকে একটা বড় রকমের শাস্তি দিয়া যাওয়া হইত।

কিন্তু আজ সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, মৃত্যু যদিও হয় এক্ষেত্রে

তাহার আর আসিবার সম্ভাবনা নাই। আর প্রেমের অভিমানে মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া সে হয়ত' স্বস্তিলাভ করিতে পারে—কিন্তু মরণের পরে তাহার বিজয় গৌরব যদি কিছু থাকে—তাহার কোন অংশই সে যে উপভোগ করিতে পারিবে না, আর রোশেনার যদি সত্যই কিছু পরাজয় হয়, তাহাও সে দেখিতে আসিবে না, এ কথাটাও সে বারংবার না ভাবিয়া থাকিতে পারে নাই।

তারপর সেদিন যখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল, আর রোশেনা বিদায় লইবার জন্য তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল মাত্র, কিছুই বলিতে পারিল না, সেদিন সেত' নিজের মনকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। তাই রোশেনা অনুমতি প্রার্থনা করিবার আগেই সে মৃদু হাসিয়া বলিল "বাড়ী যাবে রোশেনা চল তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল। কিন্তু তখনই আবার বলিল "আমার জন্য মিছে এ কষ্ট, কেন ক'রলে ভাই"—বলিয়া লাঠীটা হাতে করিয়া অগ্রসর হইল।

দুই একপদ অগ্রসর হইয়াই রোশেনা সহসা দাঁড়াইয়া বলিল "কিন্তু তোমার এ দুর্ব্বল শরীর নিয়ে নাই বা যেতে মহম্মদ?" বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

মহম্মদ তাহার দিকে ফিরিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না, তেমনই ভাবেই অগ্রসর হইয়া চলিল।

তারপর মুরুদ্দিনের বাগান বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের কাছে আসিয়া সে যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পার্শ্বের পাষাণ স্তূপটার উপর বসিয়া পড়িল তখনও রোশেনা অনেকটা পিছনে পড়িয়াছিল। সে কাছে আসিয়া বলিল "কেন এলে মহম্মদ ?"

মহম্মদ মৃদু হাসিয়া বলিল "কারণ আমি আজও বুঝতে পার্ছি না রোশেনা—যে এ জীবনটাকে এত কষ্ট ক'রে বাঁচাবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে যে জন্যই হোক্ আজ আর তা' ভাব্তে গিয়ে নিজেকে আর তোমাকেও ভুল বোঝবার অবসর আমি আর দেব' না। তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য আমি আজ থেকেই তৈরী হব'। আর যেদিন দেশ ছেড়ে যাব'—সেদিন শুধু এমনই ক'রে আর একবার আমার সুমুখে এসে দাঁড়িও, তা'হলেই আমাদের এ জীবনের চেনা শুনোর একটা হিসাব নিকাশ হ'য়ে যাবে।" বলিয়াই সে জোর করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল—আর কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু এই ধীর সংযত প্রস্থানের মধ্যেও সে রোশেনাকে যে আঘাতটা দিয়া গেল, তাহা শুধু তাহার অন্তর্যামীই বুঝিলেন। আর সব চেয়ে তাহার অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল এই জন্য যে, মহম্মদকে সে একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে পারিল না। আর বলিতে পারিল না ঠিক সেই সময়েই যে সময়ে বলিবার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল।

নহিলে ঐ যে লোকটা আজ তাহার সম্মুখ দিয়া লাঠী ধরিয়া চলিয়া গেল, আর যাইবার সময়ে এই দুর্ব্বল শরীর লইয়াও তাহার দেশত্যাগ করিবার কল্পনার কথা শুনাইয়া গেল, তাহার মত উদার মহৎ প্রাণ রোশেনা কয়টা লোকের মধ্যে দেখিয়াছে, তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না। অথচ কাহার অপরাধে সমস্ত কল্পনাই এত বেশী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল—

সমস্ত স্রোতই উল্টাপথ ধরিয়া চলিল তাহাও সে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিল না। শুধু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর সেদিন প্রভাতে মহম্মদ যখন সত্যসত্যই তাহার নিকট বিদায় চাহিল, তখন রোশেনা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহম্মদ, তুমি কি আমার জন্যই দেশ ছেড়ে চ'ল্লে?"

মহম্মদ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "তা জানিনা। কিন্তু আমাকে যেতে হবে রোশেনা, বাধা দিওনা" বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

রোশেনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল "যেওনা মহম্মদ, কি হবে গিয়ে?"

"কি যে হবে তা জানিনা। কিন্তু আমাকে যেতে হবে আমি চ'ল্লাম। তোমার কাছে আমার এই শেষ মিনতি রইল' আমাকে তুমি একেবারে ভুলে যেও। সেইখানেই আমাদের শেষ দেনা পাওনা বাকী আছে" বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল। সহসা তাহার কি মনে হইতেই রোশেনার হাতটা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া সেদিন প্রথম যেখানটায় সে তাহাকে দেখিয়া ভাল বাসিয়াছিল—সেইখানে আনিয়া বলিল "এই খানেই আমি তোমাকে সেদিন অত্যন্ত সুন্দর দেখেছিলাম। আজ যদি সময় থাকৃত' আর

একবার তেমনই ক'রে দেখ্‌তাম। কিন্তু তা' যখন আর হ'য়েই উঠ্‌ল' না"—বলিয়াই, সে রোশেনাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার ওষ্ঠে ও গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া অশ্বে আরোহণ করিল এবং করিয়াই অশ্ব ছুটাইয়া দিয়া শুধু বলিল "রোশেনা, এই শেষ এই শেষ।"

রোশেনা, ধীরে ধীরে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। আর সজল চোখে মহম্মদের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন তাহার বক্ষঃভেদ করিয়া কি কথা বাহিরে আসিতে চাহিয়াছিল তাহা সে বলিতে পারিল না সত্য, কিন্তু মহম্মদ প্রায় দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সে মৃদুস্বরে আপনিই বলিতে লাগিল "তোমার কাছেও আমার এইটাই পাওনা ছিল মহম্মদ, কিন্তু এ কখনই শেষ নয়।"

কিন্তু মহম্মদ সে কথা শুনিতেও পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

মহম্মদ ভাবিয়াছিল ভারতবর্ষে যাইয়া সৈনিকের কর্ম্মময় জীবনের অনন্ত শ্রান্তির মধ্যে তাহার পুরাতন জীবনটার মানসিক ক্লান্তি গুলাকে ডুবাইয়া ফেলিবে। কিন্তু ঠিক ভারতবর্ষ প্রবেশ মুখেই তাহার জীবনটা এত বেশী রহস্যময় কান্তি ধারণ করিল যে, সেদিন ভারতবর্ষ প্রবেশ করিতে বা পারস্যে ফিরিয়া যাইতে তাহার আর কোন উৎসাহই রহিল না।

কিন্তু সেই বন প্রদেশে বাস করাও যেমন সম্ভবপর ছিল না—সেখানকার সেই শত্রুদলের মধ্যে জীবিত মহম্মদের অভ্যর্থনারও তেমনই কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আর সবার উপরে সেই যে একজনের অনুরোধ যাহা উপেক্ষা করিতে শুধু অন্তরেই বাজে না—উপেক্ষা করিতে সাহস ও হয় না, পাছে সেই অপরিচিতার অযাচিত আত্মীয়তার মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়, সে অনুরোধ যে

অন্তরে বসিয়া অন্তরের অধীশ্বরের মতই অবিরত অঙ্গুলি নির্দ্দেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকেই অগ্রসর হইতে আদেশ করিতেছিল, তাহার শাসন-শক্তি শুধু মহম্মদ কেন বোধ করি তাহার অশ্বও অনুভব করিতেছিল, তাই আরোহীর ইঙ্গিত না পাইয়াও সে নির্দ্দিষ্ট স্থানেই আসিয়া পড়িল।

কিন্তু সুন্দরী-নির্দ্দিষ্টস্থানে আসিয়া মহম্মদ দেখিল, সেখানে তটিনী আছে কুটীরও আছে, কিন্তু সুন্দরী নাই।

নিবিড় বন; সম্মুখে পশ্চাতে, বামে ও দক্ষিণে যেদিকেই দৃষ্টি করা যায়, শুধু শ্যামল বনানীর অনন্ত নিবিড় ব্যাপ্তি; শীর্ষ তুলিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া যেন পরস্পর পরস্পরকে অসীম স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া লইতেছে। মধ্যে তাহার শীর্ণা তটিনী, মৃদু কলরবে কাহার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়া কাহার অভিনন্দন গীতি গাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে—কতকাল ধরিয়া চলিয়াছে আরও কতকাল চলিবে, কেহই জানে না।

এমনই কত কি ভাবিতে ভাবিতে মহম্মদ বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল। কিন্তু সুন্দরী আসিল না, শেষে সে বিরক্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেছিল, সহসা কোথা হইতে কোমল কণ্ঠস্বরে কে যেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "সৈনিক! অপেক্ষা করিও না আমি বন্দী হইয়াছি। এখান হইতে সোজা

রাজপূতনায় চলিয়া যাও—সেখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এখানে গুপ্তচর তোমার সঙ্গে ঘুরিতেছে। দাঁড়াইওনা, কোথাও অপেক্ষা করিও না,' বিপদে পড়িবে।

মহম্মদ আগে হইতেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল, এবার সে সম্পূর্ণ ভীত ও চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু নিয়তি তাহাকে যে পথ নির্দ্দেশ করিবে তাহাই করিতে সে বাধ্য। এই বিবেচনা করিয়াই সে ঘোড়া খুলিয়া দিল; কাহারও জন্য অপেক্ষা করিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু এইটাই সে বুঝিতে পারিতেছিল না যে, কে এই সুন্দরী? কেনই বা সে তাহাকে রক্ষা করিতে চায়? আর কেই বা এই শত্রুদল তাহাকে হত্যা করিতে চায়?

সেত' যৌবনেই বৈরাগ্যের পথে বাহির হইয়াছিল, কাহারও অনিষ্ট করিতে নয়, কাহাকেও ভাল বাসিতে নয়, শুধু তাহার জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা গুলার অবিরত আক্রমণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য। তবুও মানুষ তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতে চাহে, এতই তাহার হিংসা প্রবৃত্তি, এতই অপদার্থ সে, এতই তাহার স্বজাতি বিদ্বেষ।

আর এই যে একজন, এই কঠিন মর্ত্ত্যভূমিতে এই বেদনার, যাতনার, হিংসার মরুভূমির মাঝখানে, স্নিগ্ধ মন্দাকিণী ধারার মত, তাহার দুর্ব্বল বাহুর আবরণে তাহাকে রক্ষা করিতে চায়—এই

বা কে? মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণা করুণার মত এই নিবিড় গহনে সমস্ত বিশ্বের আত্মীয়তার বাহিরে, কে এই নারী তাহার জন্য জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া অন্ধ-আগ্রহে ছুটিয়া আসিতে চায়।

মহম্মদের ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে আবার পারস্যেই ফিরিয়া যায় কিম্বা এমন কোথাও চলিয়া যায়, যেখানে মানুষের সঙ্গে দেখা হইবে না, কোন সম্পর্ক থাকিবে না। কিন্তু হায়! আবার বুঝি তাহার মনের বনে আগুন লাগিয়াছিল, তাই সে না পারিল গৃহে ফিরিয়া যাইতে, না পারিল অন্য কোথাও যাইতে। শুধু আদেশ পালন করিবার জন্যই বোধ হয় রাজপুতানার অভিমুখে যাত্রা করিল।

সে যেদিন রাজপুতানায় আসিয়া পৌছিল, সেদিন আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমন করিয়াছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া সে সুদূর পারস্য প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিল, ঠিক ভারতবর্ষে আসিয়াই তাহার সে সমস্ত উদ্দেশ্যই ভিন্ন পথ ধরিয়া, অবাধ্য নদীর স্রোতের মত উল্টা দিকে ছুটিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

কারণ ঠিক যে সময়ে সে সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিল, সেই সময় পথে একটী ছোট মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাহাকে জানাইল, যে তাহার মা মৃত্যুশয্যায় শুইয়াছে এবং তাহাদের এমন সঙ্গতি নাই যে রোগীকে ঔষধ পথ্য দিয়া সঞ্জীবিত করিতে পারে। আর মহম্মদ যদি একবার গিয়া তাহার মাকে দেখিয়া না আসে, তাহা হইলে মায়ের সঙ্গে সেও মরিয়া যাইবে।

এই কাঙ্গালিনী এত লোক থাকিতে তাহাকেই কেন এত জেদ করিয়া ধরিল, তাহা মহম্মদ বুঝিতে পারিল না সত্য, কিন্তু একবার রোগিনীকে না দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেও, তাহার অন্তর চাহিল না।

তারপর বালিকার সঙ্গে সে যখন তাহাদের কুটীরে আসিয়া

উপস্থিত হইল, তখনই মহম্মদ জানিতে পারিল যে, এই রোগীকে রোগ যন্ত্রণাই শুধু মৃত্যুর মুখে আনিয়া ফেলে নাই, মুসলমান সৈনিকদের অত্যাচারেই বৃদ্ধার শেষ মুহূর্ত্ত অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

শুদ্ধ মাত্র তরবারী ও ভল্ল লইয়া সেদিন রাজপুতেরা এত প্রবল আক্রমণ করিয়া ছিল যে, সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া আলাউদ্দিনকে তিন তিনবার হটিয়া আসিতে হয়। সেই আক্রোশে মুসলমান সৈন্যেরা যখন উপত্যকা-বাসী দরিদ্রদের গৃহে আগুন ধরাইয়া দেয়, সেই সময় এই বৃদ্ধার গৃহখানি পুড়িয়া যায়, আর রোগকাতর দেহ লইয়া পলায়ন করিবার আগেই তাহার দেহ অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া যায়।

সেদিন বালিকা যখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার দেহের স্থানে স্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "সেদিন মুসলমানেরা যখন আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, তখন মাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে আমার গা কতখানি পুড়ে গেছে দেখ'না। বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "তখন এত জ্বলছিল দেখ না কি ফোস্কা প'ড়ে গেছে" বলিতে বলিতে সজল চোখেই হাসিয়া ফেলিল, তখন মহম্মদ অসহ্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতে ছিল। আর সুবিধা পাইলে সে বোধ হয় তখনই

এই আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া বসিত। কিন্তু অস্ত্র ধরিতে মহম্মদের তখনও বিলম্ব ছিল বলিয়াই হউক, কি সম্রাট আলাউদ্দিনের ভাগ্যটা তখনও তত অপ্রসন্ন হয় নাই বলিয়াই হউক মহম্মদের জীবনের গতি অতি শীঘ্রই অন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর মহম্মদ যখন রোগিনীর কুটীর ত্যাগ করিল—তখন বাহিরে চন্দ্র উঠিয়াছে। দূরে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কিরণে নিশ্চল উজ্জ্বল মেঘস্তরের মত—চন্দ্রলোকের দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীরের মত, সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে, নিস্তব্ধ মাধুর্য্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিল; আর এতক্ষণকার বেদনার, যাতনার, ক্রোধের নিঃশেষে অবসান করিয়া দিল।

আলাউদ্দিনের সৈন্যদলে সে যে আর নাম লিখাইবে না—তাহা স্থিরই হইয়া গিয়াছিল, ঐ বৃদ্ধাকে একটু সুস্থ করিয়া ঐ ছোট মেয়েটার মুখে একটু হাসি দেখিয়া সে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবে এইরূপ সংকল্প করিয়াই সে তাহার আবাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে ছিল। কিন্তু একটা ঝোপের কাছে আসিতেই সহসা দুইজন অশ্বারোহী সৈনিক আসিয়া তাহাকে এমনই ভাবে ধরিয়া ফেলিল যে, মহম্মদ না পারিল বাধা দিতে, না পারিল নিজের অস্ত্র বাহির করিতে। শুদ্ধ নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই সৈনিক বেশধারী দস্যুদের পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, তখন মহম্মদের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এই দস্যু দুইটা তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কোথায় লইয়া যাইতে চায় তাহা ভাবিয়া মহম্মদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অথচ এ অবস্থায় তাহাদিগকে কোনরূপ প্রশ্ন করিলে সেটা যে অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল বলিয়াই কিছু জানিতে চাহিল না।

কিন্তু হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে যখন অশ্বপৃষ্ঠে তোলা হইল তখন সে নীরব থাকিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও?"

পরিহাস করিয়া একজন উত্তর করিল, "শ্বশুর বাড়ী—যাবে?"

"শ্বশুর বাড়ী আর কে যেতে চায় না ভাই—তা' তোমাদের দেশে কি শ্বশুর বাড়ী যাবার এই নিয়ম?"

"হাঁ—বেশ আরাম পাবে।"

"তা' এখন থাকৃতেই পাচ্ছি। তা তোমরা যে এই রাত্রি-কালেও তোমাদের পথহারা ভগ্নীপতিকে চিন্তে পেরেছ'—তার জন্য তোমাদের কি ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না।"

এই পরিহাসের কি মর্ম্ম তাহারা অনুভব করিল বলা যায় না, কিন্তু খুব একচোট হাসিয়া লইয়া একজন বলিল, "আলাউদ্দিন

খিলিজি সেটা বলে দিবে—তোমাকে আর ভাবতে হবে না" বলিয়াই বন্দী মহম্মদকে লইয়া তাহারা অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

কিন্তু সেই সময়েই যে আর একজন দূরে থাকিয়া তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, মূর্খ সৈনিকদ্বয় তাহা বুঝিতেও পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মূর্খ সৈনিকদ্বয় বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহা হস্তপদ-বদ্ধ মহম্মদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। কিন্তু সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মুক্তির আশায় উৎফুল্ল হইবার বা নৈরাশ্যে কাতর হইবার কারণ যতখানিই থাক্—বিস্ময়ের আর আদি অন্ত রহিল না, এই ভাবিয়া যে এই বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি ভারতবর্ষের ভিতর এত অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। আর এখানকার এই মানুষগুলা এতখানি জটিলরহস্য কিরূপেই বা হজম করিয়া মানুষের মত হাসিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে—তাহা ভাবিতেও তাহার চিন্তাশক্তি প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল।

বালিকা রাবিয়া যাহাকে সে এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছে তাহার মাতার শিয়রে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে—সে যে কি উদ্দেশ্য লইয়া, কিসের জন্য এই রাত্রিকালে এই গভীর বনানীর

মধ্য দিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে সেইটাই সে বুঝিতে পারিতেছিল না। নহিলে অবশ্য এখানকার এই অপরিচিত দেশে, কাহাকেও বিশ্বাস করিবার বা সন্দেহ করিবার মত অভিজ্ঞতা ও অধিকার মহম্মদের তখন ছিল না। কিন্তু এইমাত্র সে যাহাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে—সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, সেই বালিকাই যে শত্রুর গুপ্তচর, আর ছলনা করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছে, এ কথা সত্য হইলেও সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। এই সুকুমার বয়সে এই বালিকা যে রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে—ভারতবর্ষের এত বড় অপবাদ সেত' কখনও শোনেই নাই—অন্য কেহ শুনিয়াছে বলিয়াও তাহার জানা ছিল না। তাই দুঃখে, বিস্ময়ে ক্ষোভে তাহার যে যন্ত্রণা হইতেছিল, বন্ধনের বা আসন্ন মৃত্যুর যন্ত্রণা ভয় তাহার ততখানি হয় নাই।

কিন্তু মহম্মদ সেদিন যখন রাবিয়ার কুটীর ত্যাগ করিয়াছিল তাহার কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধা রোগিণীর সহসা মনে পড়িয়া গেল যে, এই রাত্রিকালে এই উপত্যকার মাঝে কোন বিদেশী সৈনিককে দেখিলেই মুসলমান সৈনিকেরা তাহাকে বন্দী করিবে, এবং হয়ত' কত নির্য্যাতন করিবে, এ কথা মহম্মদকে বলিয়া দেওয়া হয় নাই। আর সে যদি সত্যই বন্দী হয় তাহা হইলে দৈহিক

নির্য্যাতন তাহার যতখানিই হউক, মানসিক কষ্ট এই বৃদ্ধার যতখানি হইবে, ততখানি বোধ হয় স্বয়ং মুহম্মদেরও হইবে না। আর তাহারই জন্য যদি মহম্মদকে মৃত্যুযন্ত্রণা পাইতে হয়—তাহা হইলে সে পাপটা যে তাহার নিজেরই হইবে এ কথা বৃদ্ধা বারংবার মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তাই সে তাড়াতাড়ি রাবিয়াকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, মহম্মদকে সাবধান করিয়া দিতে।

কিন্তু রাবিয়া যখন বাহিরে আসিল, তখন মহম্মদ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, এবং এই পার্ব্বত্য পথ অতিবাহন করিয়া সে তাহাকে ধরিতে পারিবে কি না ভাবিয়া, রাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু সেই শুভ্র চন্দ্রালোকে যখন সে দেখিল যে সহসা দুইজন সৈনিক বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া সত্য সত্যই মহম্মদকে ধরিল, তখন সে প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল। সে যে এখন আর মহম্মদের কোন উপকারেই আসিবে না—ব্যস্ততার আতিশয্যে সে কথা সে তখন ভুলিয়াই গিয়াছিল।

ফিরিবার পথে রাবিয়া যখন গভীর বনান্তরাল হইতে উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া পড়িল, তখন চন্দ্রদেব প্রায় তাঁহার গৃহে গিয়া পৌছিয়াছেন। আর সেই ধূসর চন্দ্রালোকে অস্পষ্টপথ কষ্টে নির্দ্দেশ করিতে করিতে সে যখন দ্রুতপদেই গৃহে ফিরিতেছিল,

তখন সহসা যে সুন্দরী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল, রাবিয়া তাহাকে ভূত বলিয়াও মনে করিতে পারিল না, অথচ তাহাদেরই মত সাধারণ মানুষ ভাবিতেও সাহস করিল না। শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে কিন্তু মৃদু হাসিয়া বলিল "দাঁড়ালে কেন ভাই, চল তোমাদের বাড়া যাই" বলিয়া নিজেই তাহার অগ্রে অগ্রে চলিল, যেন এই উপত্যকার কোন অংশই তাহার অপরিচিত নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বহুদিন পূর্ব্বে এমনই এক শান্ত সন্ধ্যায়—এমনই এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশিতে আলাউদ্দিন এক কৃষককুমারীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন।

সেদিনকার সেই স্তিমিত নক্ষত্রালোকে একাকী আলাউদ্দিন কোথা হইতে ফিরিতেছিলেন, পথে এক কৃষককুমারীকে একদল ছাগল লইয়া আসিতে দেখিয়া পথ দিবার জন্যই বোধ হয়, তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

অশ্ব হইতে নামিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু অশ্ব ও অশ্বারোহী পথ দিতে গিয়া পথকেই এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন যে, কৃষককুমারীর সে স্থান অতিক্রম করা দূরে থাকুক ভয়ে তাহার ছাগলগুলাই ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

আলাউদ্দিন এতক্ষণ বালিকার মুখের পানেই তাকাইয়া-

ছিলেন—কিন্তু তাঁহারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ছাগলগুলা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল দেখিয়া কতকটা অপ্রতিভ হইয়া নিজেই ধরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কৃষকবালা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া নিজেই তাহাদের সংযত করিয়া আনিয়া যখন বলিল "আমার পথ ছাড়িয়া দিন" তখন আলাউদ্দিন দ্বিতীয় বার অপ্রস্তুত হইয়া অশ্বকে পথ হইতে টানিয়া সরাইলেন—এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া বোধ হয় চলিয়াই যাইতেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের কোথায় কি একটা খোঁচ বাধিয়া গিয়াছিল—তাই তিনি অশ্বকে দুই পদ চালাইয়াই সহসা থামিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু তোমার বাড়ী কোথা ?"

কৃষককুমারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহার পিতার কুটীরখানি দেখাইয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। পশ্চাতে তাহার অনন্ত পৃথিবী তেমনই শান্ত গম্ভীর—তেমনই স্নিগ্ধ সরস রহিয়া গেল। আর উপরের অনন্তনীলাকাশ তেমনই অশ্রান্তপ্লাবনে ধরিত্রীকে জ্যোৎস্না-প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল।

কিন্তু সেদিনকার সেই চতুর্দ্দিকের সম্পূর্ণতার মধ্যে—ধরিত্রীর সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে বাকী রহিয়া গেল, একটু অপূর্ণতা—একটু ব্যবধান শুধু সাহজাদা আলাউদ্দিনের হৃদয়ে।

কারণ সুন্দরী কৃষককুমারী যে হাসির রাশি ছড়াইয়া চলিয়া

গেল—তাহারই ফাঁসী যে আর একদিন কেন, এমন অনেকদিনই তাহাকে এই পথে টানিয়া আনিবে, তাহা তিনি প্রায় জানিতেনই, কিন্তু এই আসা যাওয়ার শেষফল যে কোথায় কি আকৃতি লইয়া দেখা দিবে—তাহা এতখানি জ্যোৎস্নার আলোকেও ভাবী ভারত-সম্রাটের অন্তরে অন্ধকার হইয়াই রহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তার পর একদিন গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আকাশ যখন মানবের মাথার ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, ঝটিকায়—গর্জ্জনে-বর্ষণে, সৌধ হর্ম্ম্য কুটীর, বৃক্ষ, কানন, পৃথ্বী প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল—সেদিনকার সেই গাঢ় অন্ধকারে সেই সিক্ত আকাশ পৃথ্বীর মাঝখানে শুভ্র অশ্বপৃষ্ঠে ভাবী ভারত-সম্রাট আসিলেন দীন কৃষকের কুটীরে—কুটীরের কোহিনুর হরণ করিতেই, কি কুটীরবাসীর অবশ্যম্ভাবী সৌভাগ্যের সূচনা করিতে।

সেদিন তাঁহার সিক্ত অশ্বের শুভ্র পৃষ্ঠের উপর দিয়া যখন চপলার চঞ্চলগতি শিহরিত হইয়া যাইতেছিল, আর তাহার ক্ষণপ্রভায় সিক্ত শুভ্র অশ্বকে ও অশ্বারোহীকে অধিকতর জ্যোতি-র্ম্মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই কৃষকবালা দরিয়া আসিয়া তেমনই ক্ষীণহাস্তে আলাউদ্দিনকে অভিনন্দন করিল।

ক্ষীণহাস্য; তবু তাহাতেই কত বেদনা—কত হর্ষ—কত আশা—কত নৈরাশ্য, তাহা বোধ হয় ভাবী ভারত-সম্রাটের, অবস্থায় না পড়িলে, সেই শতক্ষত, তবু বিশ্ব-বিস্তৃত অন্ধকারে নির্ণয় করিবার মত ক্ষমতা বা সাহস কাহারও হইত না।

উপরে অনন্ত আকাশ, গাঢ় অন্ধকার সমাচ্ছন্ন; নিম্নে অনন্ত পৃথিবী আকাশের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধরিয়া অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ; আকাশেও বিদ্যুৎ নিম্নেও বিদ্যুৎ। তবে আকাশের বিদ্যুৎ জাগিয়া উঠিয়াই গভীর অন্ধকারে মিশিয়া যায়, আকাশের বক্ষে কোন রেখাই থাকে না, আর নিম্নের বিদ্যুৎ যখন একবার ঝলসিয়া যায়, সে আর পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না, দাগ একটা রাখিয়াই যায়। নহিলে আজ ভাবী ভারতসম্রাট যে দীনকৃষকের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন, সে কি এই দরিদ্র কৃষককে করুণা করিতে ?

দরিদ্র কৃষক; তবু তাহার গৃহিণী-বিহীন পর্ণকুটীরে যাহা কিছু সংস্থান ছিল—তাহা দিয়াই সে অপরিচিত অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিল। সম্রাটই হউন আর ভিখারীই হউন, যিনি আজ তাহার গৃহে অভ্যাগতের মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন—তিনি ত' দেবতা। এই দেবতাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য যে কোমল নিপুণ হস্তের প্রয়োজন ছিল, তাহা যখন দেবতার

ইচ্ছাতেই অন্তর্হিত হইয়াছে, তখন বালিকা দরিয়াকেই অতিথির অভ্যর্থনা করিতে হইল। দীনকৃষক তাহার আতিথ্যের সামান্য উপঢৌকন লইয়া যে ভাবী সম্রাটকে অভিনন্দিত করিতে চলিয়াছিল তাহা সে জানিত না বটে, তবু আজ আকাশের এই ঘন গর্জ্জনেই হউক কি বৃষ্টি বিধৌত রজনীর শান্ত কোমল মুখশ্রী দেখিয়াই হউক সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যে আজ যদি তাহার পত্নী বাঁচিয়া থাকিত—তাহা হইলে এই অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তাহাকে ভাবিতেও হইত না। দীন-কৃষকের গৃহে বিধাতা এমন কি দিয়াছেন—যাহা দিয়া সে অতিথিকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিত, সে কথাটা সে ভাবে নাই, এমন নয়, তবুও তাহার মনে হইতেছিল যে আজ যদি সে বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে বুঝি অতিথিকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে পারিত। আর আজ বহুদিন পরে পরলোকগতা পত্নীর পাংশুবর্ণ মুখখানি মনে করিয়া বৃদ্ধ কৃষক দুই ফোঁটা অশ্রু না মুছিয়া থাকিতে পারিল না।

কিন্তু এই বৃদ্ধ কৃষক অতিথির জন্য যতটা চিন্তান্বিত হউক, অতিথি কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছুমাত্র বিচলিত ছিলেন না এবং সে কথা বারংবার এই বৃদ্ধকে জানাইয়া তিনি যখন শয্যাগ্রহণ করিতে নির্দ্দিষ্ট ঘরে উঠিয়া গেলেন, তখনও দরিয়া তাঁহার শয্যা-

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। আলাউদ্দিন ঘরে ঢুকিতেই সে সসম্ভ্রমে বলিল "আপনাকে আজ এই বিছানাতেই বিশ্রাম ক'র্ত্তে হবে—শুয়ে পড়ুন—রাত্রি হ'য়েছে" বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা আলাউদ্দিন তাহাকে ডাকিয়া বলিল "কিন্তু দরিয়া বিবি"—

দরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "কি ব'লবেন হুজুরালী"।

আলাউদ্দিন বিক্ষিপ্ত কল্পনা গুলাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিলেন "দরিয়া তোমার এ যত্ন আমি ভুল্‌ব না।"

"হুজুরের মেহেরবানী—আমরা গরীব লোক আমরা যত্নের কি জানি।"

আলাউদ্দিন বলিয়া উঠিলেন—"এত যত্ন ভারত-সাম্রাজ্ঞীও"—বলিয়াই সহসা থামিয়া গিয়া পুনরায় বলিলেন—"দরিয়া আমায় মনে রাখবে?"

দরিয়া ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল "তাতে আপনার কি যায় আসে সাহেব।"

"হয়ত' আসে দরিয়া, নৈলে আজ তোমারই দ্বারে এসে অতিথি হব' কেন?"

"হুজুরের মেহেরবাণী—" বলিয়া একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু এই সময়

একটা দমকা বাতাসে ঘরের প্রদীপটা নিভিয়া গেল—আর সেই অন্ধকারে আলাউদ্দিন ডাকিলেন—"দরিয়া"।

"কি হুজুরালী"।

"একবার দাঁড়াও"।

"না হুজুরালী, রাত্রি অনেক হ'য়েছে শুয়ে পড়ুন" বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল —সহসা আলাউদ্দিন আসিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন "দরিয়া আমাকে তুমি ভাল বাস?"

দরিয়া কোন উত্তর দিল না। সেই অন্ধকারেই আলাউদ্দিনের মুখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিল। এই সময় একবার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইয়া অন্ধকার ঘরকে তাহার ক্ষণপ্রভায় ক্ষণদীপ্ত করিয়াই চলিয়া গেল। আর তাহারই আলোকে ভাবী ভারতসম্রাটের ওষ্ঠাধর আসিয়া দীনকৃষক-কুমারীর ওষ্ঠে স্থাপিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কৃষক-কন্যা হইলেও দরিয়ার অঙ্গে সেদিন কৈশোর যৌবনের যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছিল, আর সেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে কৈশোরের ক্রমশঃ পরাজয়ের সঙ্গে যে রূপজ্যোতিঃ নিশীথের নক্ষত্রজ্যোতিঃর মতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া, যৌবনের জয়-পতাকা বক্ষে মুখে দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল—তাহা দেখিলে যে কেহই মুগ্ধ হইতে পারিত; আর আলাউদ্দিন তাহাকে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—যখন গোধূলি-ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে দিনমান বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে—আর সন্ধ্যা পুঞ্জীকৃত নক্ষত্রের মালা পরিয়া ধরিত্রীর অঙ্গে অঙ্গে স্নিগ্ধ শীকর ছড়াইয়া অভিসারের পথে বাহির হইয়াছে—পথেই প্রিয়তম-দর্শনের উদ্দেশ্য লইয়া।

সেদিনকার নম্রসন্ধ্যার শান্ত কোমল মুখশ্রী দরিয়ার আসন্ন যৌবনপুষ্ট অঙ্গে বাহুতে মুখের উপর পড়িয়া যে প্রায় অনাস্বষ্ট

মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া রূপমুগ্ধ সাহজাদার অন্তর যে বিচলিত হইবে—তাহাত' যে কেহই অনুমান করিতে পারে।

তবুও আলাউদ্দিন সেদিন ভাবিয়াছিলেন যে এই সুন্দরী যদি দীনকৃষককন্যা না হইয়া ভদ্রগৃহস্থের কন্যা হইত, যদি গভীর অরণ্যে এই পুষ্প না ফুটিয়া অন্ততঃ প্রান্তরেও ফুটিত, তাহা হইলেও এই পুষ্প চয়ন করিতে সাহজাদার হস্ত হয়ত তত ক্ষত বিক্ষত হইত না—যত হইবে গভীর অরণ্যানী ভেদ করিয়া এই পুষ্পচয়ন করিতে যাইলে। কিন্তু যাহা হইবার নয়—তাহা যখন হইবেই না—তখন বর্ত্তমানকে ছাড়িয়া কল্পিত ভবিষ্যৎকে আঁকড়াইয়া ধরিতে আলাউদ্দিন প্রস্তুত ছিলেন না—নহিলে স্নেহময় পিতৃব্যের বক্ষে ছুরী বসাইতে পারিয়াছিলেন তিনি কাহার বলে?

সেদিন গভীর রাত্রে দরিয়া যখন অতিথির কক্ষ হইতে বাহিরে আসিল, তখন পৃথিবী গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল—আর সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া সে যখন টলিতে টলিতে নিজের ঘরে আসিয়া মেজেতেই শুইয়া পড়িল, তখনই তাহার প্রথম মনে হইল যে, সে আজ যে নূতন প্রণালীতে আত্মহত্যা করিয়া আসিল তাহার পরিণতি কোথায়? কিন্তু আলাউদ্দিন তাহার কর্ণে যে আশার সঙ্গীত ঢালিয়া দিয়াছিলেন,তাহারই কুহকময় স্বপ্নে সেদিন

দরিয়ার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; তখন যে তাহার চক্ষে সমস্ত পৃথিবী সবেমাত্র সজীব হইয়া উঠিতেছিল, সেদিন তাহার আশে পাশে আকাশে বাতাসে প্রকৃতি যে মধু ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহার আকাশ ব্যাপিয়া অন্তর ব্যাপিয়া যে মোহন সঙ্গীতময় মুরলিধ্বনি নিরন্তর ধ্বনিত হইয়াই যাইতেছিল, তাহার মূর্চ্ছনা যে কুসুমিত লতার মত দরিয়ার বাহিরের দেহটাকেও শিহরিত করিয়া তুলিতে ছিল, বসন্ত বাতাস যেমন তাহার পেলব নিঃশ্বাসে নবমুঞ্জরিত লতিকার অঙ্গে মৃদু শিহরণ জাগাইয়া দিয়াই চলিয়া যায়।

নহিলে প্রথম যখন সে আলাউদ্দিনকে দেখিয়াছিল জ্যোৎস্নালোকে, অশ্বপৃষ্ঠে, অপরিচিত পথিকের বেশে, তখনত' তাহার অন্তরে কোঁন রেখাই পড়ে নাই। আর আজ এই অন্ধকারে, মেঘ ও বৃষ্টির নৈশ অভিসারে, সে যে অভিসারে আসিল, আর আসিয়াই তাহাকে জয় করিয়া লইল, এই বা তাহার কোন্ যাদু মন্ত্রের প্রভাবে তাহাও সে বুঝিতে পারিল না ; শুধু মধু উৎসবের রঙ্গীন্ উৎসাহের মত আশায়, আনন্দে, লজ্জায়, গণ্ড তাহার গোলাপী আভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু এই লজ্জা এই আনন্দ আবেশ ও উৎসাহের শেষ হইল সেইদিন, যেদিন কিশোরী কুমারীর অঙ্গে পুরুষের প্রেম নিজের দেহ বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল; আর দাঁড়াইল লজ্জা অপমান, পৃথিবীর যত কিছু নিন্দাবাদ নারী-চরিত্রের কলঙ্ক মাথায় লইয়া।

কিন্তু তবু এই সুখাবেশের স্বপ্নময় দিনগুলা, আর এই কলঙ্কময় অবসাদের দিনগুলার মধ্যে যে ছয়টা মাস কাটিয়া গিয়াছে সে ছয় মাস সে কতবার কতস্থানে আলাউদ্দিনকে দেখিয়াছে, অরণ্যে প্রান্তরে, উপত্যকায়, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, তেমনই আবেগময়, আশার কুহকময়, প্রেমের সঙ্গীতময়।

কিন্তু আজ তাহার ভাগ্য বিবর্ত্তনের সঙ্গে দরিয়ার পিতা যখন তাহাকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিল, তখন সে আলাউদ্দিনের কাছেও স্থান পাইল না। নারীর দৌর্ব্বল্য আর যতগুলা নিন্দা

অপবাদ সম্ভব ও অসম্ভব হইতে পারে, তাহাই লইয়া তাহাকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল।

আলাউদ্দিন কোন দিনই তাঁহার প্রকৃত নাম বলেন নাই। তিনি দরিয়ার কাছে মনসবদার আলিখাঁ নামেই পরিচিত ছিলেন। এই মনসবদার তাহার কর্ণে যে আশার কুহকবাণী ঢালিয়া বলিয়াছিলেন যে এক নির্জ্জন সুন্দর গৃহের অধীশ্বরী করিয়া কৃষক-কন্যা দরিয়াকে তিনি সাহজাদীর আদরে রাখিবেন সে আশ্বাসবাণী সরলা কৃষকবালা সেদিন বিশ্বাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু আজ তাহার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাতের দিনে সে বিশ্বাস তাহার মোটেই ছিল না। তবু এই ভগ্ন-হৃদয়কে কতকটা জোড়া দিবার অভিপ্রায়েই সাহজাদীর আদরে না হউক দাসীর অবস্থায় একটু মাথা গুঁজিবার স্থান পাইবার আশায় সে যেদিন রাজদ্বারে আসিয়া আলিখাঁর সন্ধান চাহিল, সেদিন প্রহরীরা উচ্চহাস্যে তাহার পাগলামী করিবার স্থান অন্যত্র নির্দ্দেশ করিয়া পথমুক্ত করিতে বলিল এবং তাহার রূপযৌবনের উপর একটু কটাক্ষপাত করিতেও ছাড়িল না।

কিন্তু এই সময়েই সাহজাদা আলাউদ্দিন সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইতেই প্রহরীরা সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দাঁড়াইল এবং দরিয়াকে তর্জ্জন করিয়া দূরে যাইতে বলিল।

কিন্তু দূরে যাওয়া দূরে থাক, এইমাত্র যাহার রূপ যৌবনের উপর তাহারা কতই না কটূক্তি করিতে ছিল, সেই পতিতা অভাগিনীই যখন সাহজাদার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, আর সেই ছিন্নবেশা রুক্ষকেশা তেজো-গর্ব্বময়ী ভিখারিণীর নয়ন সম্মুখে প্রবল প্রতাপ সাহজাদাও নত হইলেন, তখন মূর্খ প্রহরীরা শুধু বিস্মিতই হইল না, পরম ভীত হইয়া উঠিল।

আর আলাউদ্দিন ? নির্মেঘ আকাশ হইতে প্রশস্ত দিবালোকে যদি বিদ্যুৎ চমকিয়া যায় কিম্বা নিজের দেহ হইতে সহসা যদি মাথাটা উড়িয়া যায় তাহা হইলে মানুষ যতখানি বিস্মিত হইতে পারে, আলাউদ্দিন বোধ হয় তার চেয়েও বেশী বিস্মিত হইয়া-ছিলেন, দরিয়ার এই অকস্মাৎ রাজদ্বারে আবির্ভাব দেখিয়া। কিন্তু তাঁহার সেই বিস্ময় সম্পূর্ণ ভয়ে পরিণত হইল তখন, যখন দরিয়া একটা অস্বাভাবিক হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "সাহজাদা ? আলিখাঁ সাহজাদা" বলিয়াই তাহার এই অর্থহীন হাসিটার মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া কি জানি কেন আর এক চোট খুব হাসিয়া লইল।

কিন্তু তাহার এ হাসি যে অন্তরের কোন্ হিমালয় শিখরস্থ জমাট বাঁধা অশ্রু আজ গলিয়া গলিয়া প্রস্রবণের আকারে দরিয়ার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা অন্য কেহ না বুঝুক,

আলাউদ্দিনের কাছেও' অপরিচিত ছিল না। আর এইটাই তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, যে এই হাসির অন্তরালে, অত্যাচারিতের যে অশ্রু লুকানো আছে, তাহা যদি জাহ্নবীধারাও হয়, তাহা হইলেও সেই বিন্দু বিন্দু জলধারা আজ পৃথিবীর কোন কূল ভাসাইতে, কাহাকে ধ্বংশ করিতে ঐ মেয়েটার নিভৃত অন্তরের চক্ষু দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে।

সাহজাদা চিরদিন বিলাস দেখিয়াছেন, হাস্য লাস্য নারীর চাতুরী দেখিয়াছেন; স্বপনে, সঙ্গীতে, কামনার ইঙ্গিতে গা ভাসাইয়াছেন, কোন দিন ত' তিনি অত্যাচারিতা নিরাশ্রয়া নারীর দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখেন নাই। কোন দিনত' ভাবেন নাই যে, সাহজাদার বিলাসের জন্য যে পুষ্প চয়িত হয়, তাহার বোঁটা হইতেও পুষ্পের শোণিত ক্ষরণ হইয়া চয়িতার হস্ত কলুষিত করিতে পারে; কল্পনাও করেন নাই যে এমন দিন আসিতে পারে যেদিন এক দরিদ্র কৃষকবালার সম্মুখে ভাবী সম্রাটের উন্নত মস্তক অবনত হইতে পারে। তাই আজ সহসা তাঁহার অন্তরের দ্বারে একটা প্রবল আঘাত আসিয়া প্রতিহত হইল, বন্যার জল যেমন উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপে আসিয়া প্রহত হয়, কিম্বা সমুদ্রের সফেন তরঙ্গরাশি যেমন করিয়া পর্ব্বত গাত্রে আছাড়িয়া পড়ে।

তাই আজ সাহজাদা আলাউদ্দিন এই সমস্ত প্রহরী বেষ্টিত থাকিয়াও না পারিলেন ভিখারিণীর আবেদন তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাইতে, না পারিলেন নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে ; শুধু "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু অধিকক্ষণ এ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিলে শুধু যে প্রহরীদের সম্মুখেই অপদস্থ হইতে হইবে তাহা নয়, দরিয়া যদি নিজের কলঙ্ক প্রচার করিয়া দেয়, তাহা হইলে এই সমস্ত প্রহরী মণ্ডলীর মাঝখানে সাহজাদার উন্নত শির যে কতখানি অবনত হইবে, আর এই কথা লইয়া কতরকম অপ্রিয় সমালোচনাই যে প্রাসাদের অভ্যন্তরে বাহিরে বিঘোষিত হইতে থাকিবে, তাহাও তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছিলেন ; তাই এই ভিখারিনীকে তাঁহার খাস কামরায় পাঠাইয়া দিতে বলিয়া তিনি সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

দরিয়া যখন সাহজাদার খাস কামরায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ক্রোধে, লজ্জায়, ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। কিন্তু এতদিন যাহাকে সে আপনার বলিয়া, প্রিয় বলিয়া, স্বামী বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকে তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে এত দূরে এত উচ্চে অবস্থিত দেখিয়া সে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল; আর কাঁদিতে কাঁদিতে সেই মখমল মণ্ডিত মেজের উপর পড়িয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল "সাহজাদা, তুমি সাহজাদা ব'লে, দেশের রক্ষক, দরিদ্রের প্রতিপালক ব'লে, এক হতভাগিনী দরিদ্র কৃষকের মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রলে কেন? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ ক'রেছিলাম সাহজাদা।"

কিন্তু আলাউদ্দিন অত্যন্ত ধীরভাবে তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন "দরিয়া, আমি তোমার উপর অন্যায় ক'রেছি বটে, কিন্তু আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইনা—বলিতে বলিতে তিনি দরিয়ার হাত ধরিলেন। দরিয়া কিন্তু সহসা অত্যন্ত শক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "না না আমায় স্পর্শ ক'রনা! তার আগে আমি শুন্‌তে চাই তুমি আমায় বিবাহ ক'র্ব্বে কি না? সাহজাদা, আমি নারী ব'লে, দরিদ্র ব'লে, আমার ধর্ম্মের কি কোন মূল্য নাই? আমার এই দেহের কি কোন মর্য্যাদাই নাই? না না সাহজাদা তুমি আমায় বিবাহ কর, তোমার দুটীপায়ে পড়ি সাহজাদা"

বলিতে বলিতে হতভাগিনী দরিয়া আসিয়া আলাউদ্দিনের পদপ্রান্তে নিপতিত হইল।

আলাউদ্দিন কিন্তু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "তা হয় না দরিয়া।"

"কি হয় না।"

"সাহজাদার সঙ্গে কৃষকের কন্যার বিবাহ সম্ভব হয় না।"

"কিন্তু সেদিন সম্ভব হ'য়েছিল, যেদিন একটীবার মাত্র দর্শনেই মেঘও বৃষ্টির রাতে কৃষকের কুটীরে সাহজাদা আশ্রয় নিয়েছিলেন, কৃষকের কন্যার সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে। সেদিন সম্ভব হ'য়েছিল যেদিন মনসবদার আলিখাঁ সেজে দৈন্য-প্রপীড়িতা কৃষককুমারীকে ছলে ভুলিয়ে তা'কে অন্ধকারে নামিয়ে দিয়েছিলে; সেদিন সম্ভব হ'য়েছিল – বলিয়া দরিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, আলাউদ্দিন তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "সে সব কথা ভুলে যাও দরিয়া, আমি যা' ক'রেছিলাম সে সব তোমারই প্রেমে। কিন্তু আমি তোমাকে বিবাহ ক'র্ত্তে পারি না। সম্রাট্ বা তাঁ'র কোন পারিষদই তা' অনুমোদন ক'র্ব্বেন না।

"কিন্তু ধর্ম্ম ক'র্ব্বেন। ধর্ম্মের কাছে ঈশ্বরের কাছে তুমি আমায় বিবাহ ক'রে দূর ক'রে দাও! আমি তোমার সিংহাসনের দাবী ক'র্ত্তে চাই না। শুধু আমার পিতার কাছে, আমার দরিদ্র

কুটীরে—আমার স্বাধীনতাটুকু ফিরিয়ে দাও। এইটুকু দয়া কর—নৈলে —

"নৈলে কি ক'র্ব্বে দরিয়া?" বলিয়া আলাউদ্দিন একটু হাসিলেন।

"নৈলে আমি সম্রাটের কাছে বিচার প্রার্থনা ক'র্ব্বো" বলিয়া ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত দরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই বলিল আমি সম্রাটের কাছে বিচার প্রার্থনা ক'র্ব্ব, দেখ্‌ব—সাহজাদার অত্যাচারের প্রতিকার হয় কিনা?" বলিয়াই সে চলিয়া যাইতে ছিল। আলাউদ্দিন ডাকিয়া বলিলেন "শোন দরিয়া "

"কোন কথা শুনতে চাইনা সাহজাদা, আমি সম্রাটের কাছে নিবেদন ক'র্ব্ব যে দরিদ্র সৈনিকের বেশে সাহজাদা আমায় বিবাহ ক'র্ব্বার প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্রা কৃষককুমারীর সর্ব্বনাশ ক'রেছেন; এবং তাঁর ঔরসজাত পুত্র আমার গর্ভে—বলিয়াই সে দৃপ্ত পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিতেছিল।

সহসা আলাউদ্দিন তাহার হাতটা ধরিয়া বলিলেন "কিন্তু সম্রাট্ যখন জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন, যে বিবাহের পূর্ব্বে যে একজনকে আত্মসমর্পণ ক'রেছিল, সে যে দ্বিতীয় জনকে করে নাই · তার কোন প্রমাণ আছে? দরিয়া বিবি, তখন তার কি উত্তর দেবে?"

বলিয়া তিনি ঈষৎ জয়ের হাসি হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে যাইতেছিলেন—কিন্তু এই সময় তাঁহার হস্ত হইতে দরিয়ার হস্ত স্খলিত হইতেই চাহিয়া দেখিলেন যে দরিয়া মেজের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তারপর প্রায় পাঁচ মাস অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ মাস কাল দরিয়া এক নাতিপ্রশস্ত অথচ সুসজ্জিত কক্ষে একজন ধাত্রীর রক্ষণে প্রায় বন্দী অবস্থাতেই বাস করিতেছিল, কিন্তু তাহার এই দুঃখ দুর্দ্দশার, এই অবরোধ যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইল সেইদিন, যেদিন নিপুনা ধাত্রীর সহায়তায় সে একটি সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়া নিরাশ হৃদয়ে কতকটা আশার শক্তি সঞ্চয় করিল।

কিন্তু শক্তি সে যতটাই সঞ্চয় করুক, আর এই বংশ-গৌরব-হীন শিশুকে তাহার ভগ্ন হৃদয়ের বহির্দ্বারে যত জোরেই চাপিয়া ধরুক, ইহারই জন্য সেদিন দরিয়ার ভয় ও ভাবনার অন্ত ছিল না। কারণ মানুষের মন যে অন্তর্যামী, তাহাও যেমন তাহার অবিদিত ছিল না, সেই অন্তর্যামীই সেদিন অন্তরে বসিয়া মৃদু গুঞ্জনে কি আশঙ্কা জাগাইয়া বলিয়া দিতেছিল যে, এইখানেই এই

দুঃখ দুর্দ্দশার শেষ নয়—তাহার ললাটে আরও দুর্গতি আছে—তাহাও তাহার অন্তরের কাছে তেমনই অপরিচিত ছিল না।

নহিলে সেদিন যখন সে সংসারের সমস্ত স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া, অত্যাচারে অভিশাপে জর্জ্জরিত হইয়া, রাজদ্বারে আসিয়াছিল তাহার গুপ্ত প্রণয়ীর অনুসন্ধান করিতে, আর আসিয়াই তাহাকে সাহজাদার মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিল, সেদিন তাহার অন্তরে শুধু মহাভয়েরই উদয় হয় নাই—সেই একদিনকার একটী মূহুর্ত্তে দরিয়ার সমস্ত ভবিষ্যৎজীবন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল।

কারণ সেই দিনই সে প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নারীর সৌন্দর্য্য শুধু পুরুষের বিলাসের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, পুরুষ তাহাকে যতই উপাদেয় অভিধানে অভিহিত করুক। নহিলে সেদিন যখন সে তাহার নারী-দেহটার মর্য্যাদার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বারংবার তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আলাউদ্দিনকে অনুরোধ করিয়াছিল, তখন ত' সে জানিত না যে, সংসারে যা' সত্য ও সুন্দর তাহাকেই মিথ্যার বেশ পরাইয়া প্রকাশ্য আলোকে লাঞ্ছিত করিতে রাজনীতি যতখানি শক্তি ধরে, তত শক্তি বোধহয় সংসারের কোন নীতিই ধরে না। নহিলে সেদিনকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দরিয়ার অবসন্ন দেহটা

মূর্চ্ছিত হইয়াই বা পড়িয়া ছিল কেন? আর মূর্চ্ছাভঙ্গে সে তাহাকে অবরোধের মধ্যেই বা দেখিতে পাইল কেন?

তবু সে মনে করিয়াছিল' যে হয়ত' এই সুকুমার শিশুকে দেখিয়া তাহার নির্ম্মম-হৃদয় জনক অন্ততঃ স্নেহের দৌর্ব্বল্যেও একটিদিনের জন্য তাহাকে স্বীয় কন্যা বলিয়া স্বীকার করিবে; আর অন্ততঃ একটি মুহূর্ত্তের জন্যও দরিয়াকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার এই জীবনব্যাপী দুর্দ্দশার অবসান করিবে। তাই সেই আশাতে হৃদয় বাঁধিয়া দরিয়া একখানি পত্র লিখিয়া ধাত্রীর হস্তে সাহজাদার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল, সাহজাদাকে একটীবার আসিতে অনুরোধ করিয়া।

কিন্তু কৃষক কন্যা দরিয়াত' জানিত না যে, রাজনৈতিক অভিধানে স্নেহ বা প্রেমের কোন মুল্যবান অর্থই নাই—সে শুধু স্বার্থ সিদ্ধির পরিপুষ্টি কল্পে অভিনয়ের মুখোস মাত্র। জানিত না যে সিংহাসনের পথ শোণিত ঢালিয়া সুরঞ্জিত না করিলে সিংহাসনও যেমন নিষ্কণ্টক হয় না, সিংহাসনের অধিরোহণকারীর জীবনও তেমনই যমরাজের শাসন শক্তির অন্তর্গত থাকিয়াই যায়। জানিত না যে, শোণিত-সিক্ত পাদুকা লইয়া সিংহাসনে পদার্পণ করাই সেদিন রাজধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছিল।

তাই তাহার সাদর নিমন্ত্রণ যখন প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া

আসিল, তখন সে শুধু দুঃখিতই হইল না, অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল, এই ভাবিয়া যে এই ক্ষুদ্র শিশুর উপর এতটুকু স্নেহ সাহজাদার হৃদয়ে নাই, যাহার আকর্ষণে তিনি একটিবার মাত্র দরিয়ার কুটীরে আসিয়া দর্শন দিতে পারেন।

কিন্তু সাহজাদার এই তাচ্ছিল্য কি প্রেমিকের মূর্ত্তিতে, কি জনকের মূর্ত্তিতে, যতই গভীর হইয়া উঠিতেছিল, এই হতভাগ্য শিশুর প্রতি দরিয়ার ভিতরকার মাতৃস্নেহটা ততই প্রবল, ততই অতলস্পর্শী হইয়া উঠিতেছিল। তাই নিজের ভবিষ্যৎ সে যতখানি অন্ধকার দেখিতেছিল—এই হতভাগ্য মেয়েটার অদৃষ্ট যে তাহার চেয়ে অনেক বেশী অন্ধকার তাহা বুঝিয়াই বোধ হয় সে বিষে বিষক্ষয় করিবার একটা অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দরিয়া আশা করিয়াছিল যে, আলাউদ্দীন একটি বারের জন্য আসিলেও সে আর একবার তাহার পায়ে ধরিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিবে। অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও প্রকাশ্যে না হউক, গোপনে ঈশ্বরের কাছে তাহারা স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ লইয়া দাঁড়াইবে, সাহজাদার বিলাস ও ভবিষ্যৎ সিংহাসনের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিতে নয়; তাহার জীবনের কলঙ্কময় ইতিহাসটা মুছিয়া ফেলিয়া একজনের পরিনীতা স্ত্রী হইতে।

কিন্তু তাহা যখন হইলইনা। আলাউদ্দিন আসিলেন না, একখানি মাত্র পত্র দিয়া তাহার সাগ্রহ নিমন্ত্রণকে উপেক্ষা করিয়া নীরবই রহিলেন, তখন দরিয়া তাহার কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্যই আলাউদ্দিনের লেখা পত্রখানা আর তাহার সঙ্গে সামান্য একটু পত্র লিখিয়া একটা স্বর্ণ পদকের মধ্যে পুরিয়া কন্যার গলায়

ঝুলাইয়া রাখিল। আর আলাউদ্দিন যে অর্থ পাঠাইয়া ছিলেন তাহার কিয়দংশ ধাত্রীর হস্তে দিয়া এই শিশু কন্যাকে গোপনে স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, কল্য প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ধাত্রী শিশুকে লইয়া প্রস্থান করিবে, আর দরিয়ার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, ধাত্রীই তাহাকে নিজ কন্যা জ্ঞানে পালন করিবে। আর যদি সে বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে সে বয়স্থা হইলে তাহার জন্ম ইতিহাসের কথা তাহাকে জানাইবে—তাহার পূর্ব্বে এই পদকের রহস্য তাহাকে কিছুতেই জানিতে দিবে না।

কিন্তু সেদিন রাত্রে আবার তেমনই ঝড়, তেমনই জল, মেঘও বিদ্যুতের তেমনই নির্ম্মম অস্ত্রক্রীড়া চলিতে লাগিল—যেমন করিয়া সেদিন চলিয়াছিল, যেদিন সিক্ত শুভ্র অশ্বপৃষ্ঠে সাহজাদা গিয়াছিলেন দীন কৃষকের কুটীরে তাহার প্রেমের প্রথম আবেদন লইয়া। সেদিনও ধরিত্রীর অঙ্গে অন্ধকার সেই রকমই কৃষ্ণ অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছিল, আর দরিয়ার বক্ষঃ ও তেমনই দুরু দুরু কাঁপিয়াছিল, যেমন কাঁপিয়াছিল এক বৎসর পূর্ব্বে যখন সে দস্যুকে রত্নাকর ভাবিয়া তাহার নারী দেহটাই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল প্রেমের রাজা জ্ঞানে অন্তরের অধীশ্বর জ্ঞানে।

কিন্তু সেদিন তাহার আশা ছিল আশ্রয় ছিল, অধরে হাস্য ছিল, গ্রীবায় গর্ব্ব ছিল, অন্তরে তেজ ছিল, অঙ্গে লাবণ্য ছিল নয়নে বিদ্যুৎ ছিল। আর আজ তাহার আশা নাই নৈরাশ্য আছে, আশ্রয় নাই অবরোধ আছে, হাস্য নাই অশ্রু আছে, গর্ব্ব নাই পরাজয় আছে, তেজ নাই দীপ্তি আছে। আর আছে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ক্ষীণ লাবণ্যধারা কুসুমিত নয় নির্ব্বাপিত। আছে বিদ্যুৎ, চঞ্চল নয় নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত। সেদিন তাহার অন্তরে একটা স্নেহের রাজ্য বসিয়া গিয়াছিল, আর বাহিরে বসিয়াছিল অত্যাচারের দানবী ক্রীড়া রাজ্যের মতই বিস্তৃত, রাজধর্ম্মের মতই নিষ্ঠুর।

তবুও সেদিনকার সেই মেঘ-মন্দ্রিত বিদ্যুৎ স্পন্দিত আকাশের নিম্নে সেই বিচ্ছুরিত বিকম্পিত অন্ধকারে, শীতল স্পর্শী সমীরণ কাহার বারতা কোথা হইতে বহিয়া আনিয়া, দরিয়ার বক্ষে মুখে প্রতিহত হইতেছিল, আর তাহার ব্যর্থপ্রেমের দীর্ঘনিঃশ্বাসে উষ্ণ হইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছিল। আর তাহারই মাঝ-খানে তাহার অন্তর কতবারই না শিহরিত হইয়া যাইতেছিল আর একজনের কল্পিত আগমন প্রতীক্ষা করিয়া।

বুঝি তাহার মনে হইতেছিল যে, এমনই এক বৃষ্টি বিধৌত রজনীতে সে যে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা যদি

ব্যর্থ না হইয়া সত্যের আকার লইয়া দাঁড়াইত। যদি সে প্রথম যৌবনেই প্রিয়পরিত্যক্তা না হইয়া প্রতাড়িতা অনাথার মুক্ত সংসারের পদদলিত না হইত, তাহা হইলে আজ এই স্নিগ্ধ শীতল সমীর শরীরে যে শিহরণ জাগাইয়া দিতেছে, তাহা বোধ করি শত গুণেই সুখস্পর্শ হইত প্রিয়তমের সম্মিলন সম্ভাবনা জানিয়া। হয়ত' কত অর্দ্ধরজনী এইরূপ আগ্রহে, আকাঙ্ক্ষায়, প্রিয়তমের অশুভ কল্পনায় কাটিয়া যাইত, তারপর সহসা মিলন হইত, আনন্দাশ্রুর ভিতর দিয়া কম্পিত বক্ষের আলিঙ্গনের ভিতর দিয়া।

কিন্তু দরিয়ার জীবনের সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গ্রথিত কুসুমদাম অর্দ্ধসমাপ্ত হইবার আগেই ছিঁড়িয়া গিয়াছে-বীণা একটি বার ঝঙ্কার দিয়াই নীরব হইয়াছে। এখন তাহার ভাঙ্গা খেলা ঘরে জীবন ও যৌবন পড়িয়া আছে, শুধু পথের মতই পদদলিত হইতে, তাহা সে তখনই বুঝিতে পারিল, যখন প্রিয়তমের পরিবর্ত্তে দুইজন দস্যু সেই গৃহে প্রবেশ করিল, আর ভীতা ও বিস্মিতা দরিয়াকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া কুর্নীশ করিল।

দরিয়া প্রথমে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দস্যুরা যখন কোষ হইতে তরবারী বাহির

করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি পত্র ফেলিয়া দিল, তখন তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে বোধ হয় তাহার বাকী ছিল না। তবু সে পত্রখানাতে কি লেখা আছে তাহাই দেখিবার জন্য সেখানা হাতে তুলিয়া লইয়াই সে চীৎকার করিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্র আলাউদ্দিনের লেখা তাহাতে লেখা ছিল।

দরিয়া,—

চিন্তা করিয়া দেখিলাম তোমার কন্যাকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন—আমার এই অনুচরদের সহিত তাহাকে পাঠাইয়া দিও-তাহার পালনের ভার আমি উপযুক্ত লোকের হাতেই দিয়াছি তাহার জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিও। ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট্ তাহার ভার লইতেছে। আশা করি আমার অনুরোধে কোনরূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিবে না—কারণ এই ইরানী অনুচরেরা শুদ্ধমাত্র আজ্ঞাবহ নয়—সময়ে সময়ে তাহারা তরবারীর ব্যবহার করিতেও জানে।

ইতি—

মূর্চ্ছাভঙ্গে দরিয়া যখন উঠিয়া বসিতে পারিল, তখন প্রভাতের আলো তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া ধরিত্রীর মস্তকে

করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি পত্র ফেলিয়া দিল, তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে বোধ হয় তাহার বাকী ছিল না। তবু সে পত্রখানাতে কি লেখা আছে তাঁহাই দেখিবার জন্য সেখানা হাতে তুলিয়া লইয়াই সে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্র আলাউদ্দিনের লেখা তাহাতে লেখা ছিল।

দরিয়া,—

চিন্তা করিয়া দেখিলাম তোমার কন্যাকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন—আমার এই অনুচরদের সহিত তাহাকে পাঠাইয়া দিও - তাহার পালনের ভার আমি উপযুক্ত লোকের হাতেই দিয়াছি তাহার জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিও। ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট্ তাহার ভার লইতেছে। আশা করি আমার অনুরোধে কোনরূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিবে না—কারণ এই ইরানী অনুচরেরা শুদ্ধমাত্র আজ্ঞাবহ নয়—সময়ে সময়ে তাহারা তরবারীর ব্যবহার করিতেও জানে।

ইতি—

মূর্চ্ছাভঙ্গে দরিয়া যখন উঠিয়া বসিতে পারিল, তখন প্রভাতের আলো তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া ধরিত্রীর মস্তকে

আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতে আসিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে বিহগকুল প্রভাত উৎসবের আগমনী গাহিতেছে। সংসার তেমনই উজ্জল তেমনই শান্ত কোমল মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হইতেছে, যেমন করিয়া সে সৃষ্টির প্রথম দিনে আবির্ভাব হইয়াছিল, হাসির ভিতর দিয়া সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, প্রভাত সূর্য্যের জবাকুসুম সঙ্কাশ কিরণ অঙ্গে মাখিয়া। সংসার যেমনই ছিল তেমনই আছে। শুধু সেই একটি মাত্র রজনীর মধ্যেই দরিয়ার ভাগ্যে অসম্ভব রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কারণ সেই স্বল্পান্ধকারে সে যখন পূর্ণসংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল, তখন দেখিল শুদ্ধমাত্র তাহার শিশুকন্যাকেই আলাউদ্দিন মাতৃহারা করে নাই, অভাগিনী দরিয়াকেও এক নাতিপ্রশস্ত কারাকক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছে, বোধ হয় তাহার অবশিষ্ট জীবনটাই সেইখানে অতিবাহিত করিতে।

অথচ এখনও একটি বৎসরও অতীত হয় নাই, এই আলা-উদ্দিনই দরিয়ার পদে ধরিয়া প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সহস্র প্রতিজ্ঞায় তাহার কিশোর হৃদয়ের অপ্রস্ফুট কামনাগুলাকে জাগাইয়া দিয়া কৃষক কুমারীর সম্মুখে কল্পিত রাজৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন, তৃষিত চাতকের সম্মুখে নির্ম্মল জলের সমুদ্র আনিয়া দেওয়ার মত।

আর সেই অভাগিনীই ছলনায় ভুলিয়া মোহের মদিরায় আত্মহারা হইয়া আত্মদান করিয়াছিল বলিয়া, আজ একটি বৎসর না যাইতেই স্বার্থের অনুরোধে তাহার মৃত আত্মাকে পুনঃ পুনঃ হত্যা করিবার প্রয়োজন হইল, পাছে রক্তবীজের মত সে গতাসুজীবন ফিরিয়া পাইয়া সিংহাসনের প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু আলাউদ্দিন বোধ হয় জানিতেন না যে রাজনীতিও অর্থনীতির অনেক উচ্চে আর একটা নীতি আছে, যাহার কাছে সংসারের সমস্ত নীতিই মস্তক অবনত করে। যাহার বিধান কর্ত্তা তিনিই, যিনি সমস্ত সংসারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বোধ হয় জানিতেন না যে, সেই নীতির সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে ধনী ও দরিদ্রের ভেদ নাই। তাঁহার তুলাদণ্ডে কৃত কর্ম্মের প্রতিফল সম্রাট্ ও তাঁহার দীনতম প্রজাকে সমান ভাবেই ভোগ করিতে হয়—সেখানে উচ্চ নীচের বিচারে কোন বৈষম্যই নাই। নহিলে শিশুকে তাহার মাতৃবক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া ও তাহার মাতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন কিরূপে?

বিংশ পরিচ্ছেদ
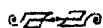
কিন্তু ষোলবৎসর পরে তিনি মহম্মদকে যে দিন কারারুদ্ধ করিলেন, এবং চিতোর ধ্বংস করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া বিনা বিচারেই তাহাকে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, সেদিন তিনি বোধ হয় জানিতেন না যে, সংসারে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী জীবিত আছে।

কিন্তু মহম্মদ যে দিন তাহার নূতন আবাস স্থানে আসিয়া প্রবেশ করিল, সেই দিনই সে জানিতে পারিল যে এই কারাগৃহে সে একা নয়, আরও বন্দী আছে এবং আর যেখানেই যে থাকুক—তাহার গৃহের পার্শ্বেই এক রমনী বন্দিনী আছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না।

প্রভাত হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, এমনই সময়ে একদিন মহম্মদ বোধ হয় বায়ু সেবনের জন্যই খোলা জানালার পাশে

দাঁড়াইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়াছিল। আর তাহার অদৃষ্টের দুর্ঘটনাগুলার বিষয় ভাবিতেছিল। কোথায় ছিল সে, কোন্ সুদূর প্রান্তে তাহার শান্তিময় জীবন লইয়া, সুখে দুঃখে জীবন তাহার একরূপ কাটিয়াই যাইত; কোন প্রয়োজন ছিল না তবু সে আসিল ভারতবর্ষে, বোধ হয় নিয়তির এই অপরূপ খেলার পাত্র হইতেই। নহিলে কোথায় ছিল হামিদ, দুদিনের জন্য আসিয়া সে রোশেনাকে কাড়িয়া লইল, আর সে ক্ষোভে, অভিমানে, অপমানে আসিল ভারতবর্ষে, তাহার হৃদয়কে একটু শান্ত করিতে; আর আসিয়াই কারারুদ্ধ হইল। নিয়তির এই নিষ্ঠুর হাসির কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখে জল একটু আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তবুও সে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না এই ভাবিয়া, যে ঈশ্বর একটা ক্ষুদ্র মানুষের উপর দিয়া এতগুলা অত্যাচার সহাইয়া লয়েন কি করিয়া?

সহসা তাহার কানে যেন কাহার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আসিয়া ঠেকিল, আর সে উৎকর্ণ হইয়া জানালার লৌহময় গরাদের কাছে সরিয়া আসিতেই শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে "উঃ আর যে সহ্য হয় না। আলাউদ্দিন, আলাউদ্দিন, একবার যদি মুক্তি পাই—"এই সময় বাতাস অন্যদিকে বহিতেই সে আর কিছুই শুনিতে পাইল না।

তবুও সে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতেই সে বুঝিতে পারিল যে, পার্শ্বের কক্ষের বন্দিনী অভিশাপের আগুন ছড়াইতেছে। কিন্তু আলাউদ্দিনের নিকট এই নারী কি এমন অপরাধ করিয়াছিল, যে তাহাকে এই নির্জ্জন কারাগৃহে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না সত্য, কিন্তু কি জানি কেন এই রমণীর প্রতি মহম্মদের সহানুভূতি অত্যন্ত অসম্ভব রূপেই বাড়িয়া উঠিল এবং এই কারাবাসে তাহার উপকার কিছু করিতে না পারুক, তাহার কারাবাসের ইতিহাসটা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

কারাবাসে কেহ সুখে থাকে না, তাহা মহম্মদ যতখানি কল্পনা করিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী সেদিন অনুভব করিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় এই নারীর স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য তাহাকে এতখানি আঘাত করিতেছিল; নহিলে যাহার মুখ পর্য্যন্ত সে আজও দেখিতে পায় নাই তাহার দুঃখে এতখানি অনুভব করার কোন কারণই ছিল না।

মহম্মদ তাহার লক্ষ্যহীন জীবনে কারাক্লেশ সহ্য করিয়াও তত বেশী বিচলিত হয় নাই, যত বেশী হইয়াছিল রাবিয়ার আচরণ দেখিয়া। সেই ছোট মেয়েটা, যে, আজ পর্য্যন্ত তাহার কৈশোর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, সেই যে

মোগলের ছদ্মবেশী অনুচর, একথা কল্পনা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাহার অঙ্গের কৃষ্ণ আবরণ আর কৃষ্ণতর আঁখি-তারকার মধ্যে যে সজল স্নিগ্ধতা ফুটিয়া বাহির হইতে ছিল, তাহার অভ্যন্তরে এতখানি ক্রুর হাসি কেমন করিয়া থাকিতে পারে এবং মোটেই থাকিতে পারে কিনা তাহাই সে ভবিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু সেদিনকার সেই নিশীথ রাত্রে পার্ব্বত্য পথে ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ যাহা সে স্বচক্ষেই দেখিয়াছিল, তাহার আর কি অর্থ থাকিতে পারে, তাহারও কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে সেদিন পর্য্যন্ত সে আসিয়া পৌছিতে পারে নাই।

মহম্মদ স্পষ্টই দেখিতেছিল যে, তাহার জীবনের সংশয় সন্ধিগুলা চিরদিন জড়াইয়াই রহিল, কোন দিন স্পষ্ট হইল না। কোথায় রহিল রোশেনা, যাহাকে পাইবার জন্য তাহার অন্তর আপনার অজ্ঞাতসারে কতবারই না অন্তর্ষামীর চরণে ভিক্ষা করিয়াছিল, সে আবেদন অন্তর্য্যামী শুনিলেন না—তাহাকে অন্ধনৈরাশ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পথে এক বনবাসিনী রূপসী তাহার জীবনদান করিল, কিন্তু কে সে, কিরূপেই বা সেখানে আসিল, এ তাহার চিরদিন জিজ্ঞাসাই রহিয়া গেল—মীমাংসা হইল না। তারপর ভীলবালা রাখিয়া সেই সরল, প্রোজ্জল,

প্রভাতের শান্ত হাসির মত সমুজ্জ্বল সমুদ্রের মত কৃষ্ণবর্ণ, 'অহারই মত চঞ্চল—নিদাঘ সন্ধ্যার মত স্নিগ্ধ .অথচ তেজস্বিনী, আগত যৌবনের ভারে ঈষৎ লজ্জিতা অথচ গর্ব্বিতা, সুহাসিনী অর্দ্ধবালিকা অর্দ্ধরমণী রাবিয়া চিরদিনই তাহার কাছে এক অদ্ভুত প্রহেলিকা হইয়া রহিল। আর সবার উপরে তাহার এই কারাবাস—এই বা তাহার কোন্ অকর্ম্মের কৃতকর্ম্ম ফল, তাহাও তাহার নিকট তেমনই অবোধ্য রহিয়া গেল।

কিন্তু অতীতের কাহিনী স্মরণ করিয়া মনকে তিক্ত করিয়া সেদিন আর কোন লাভই ছিল না। সেদিনত' তাহার সমস্ত পৃথিবী, তাহার চন্দ্র সূর্য্য, তটিনী তারকা, আলোক ও সঙ্গীত লইয়া এই প্রাচীর বেষ্টিত কারাগৃহের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল ; আর সেই বিস্মৃতির মধ্যে তখনও সজীব ছিল সে, আর পার্শ্বের কক্ষে তাহার কারা-সঙ্গিনী, তাহার অভিশাপ ও আর্ত্তনাদ লইয়া।

মহম্মদ ভাবিয়াছিল যে তাহার এই বন্ধন যন্ত্রণাই হয়ত' ভবযন্ত্রণার শেষ করিবে, কিন্তু পার্শ্বের গৃহের ঐ অভাগিনী যে দিবারাত্রই আর্ত্তনাদ করিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে, তাহারও ললাটে কি একই লিপি প্রতিবদ্ধ আছে। তাহাকেও যদি কোনরূপে মহম্মদ মুক্তি দিতে পারিত ?

সেদিন রাত্রে মহম্মদ এই সব কথা গুলাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই কি একটা অস্বাভাবিক গোলমালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই বুঝিতে পারিল যে, ভূমিকম্প হইতেছে। আর পার্শ্বের কক্ষের সেই অভাগিনী নারী ভয়ে বিস্ময়ে বিকট আর্ত্তনাদ করিতেছে। মৃত্যু আসিয়া তাহারও সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল বটে, তবু সে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছিল, যদি কোনরূপে এই অভাগিনীকে বাঁচাইতে পারে এই ভাবিয়া। এই সময়েই হঠাৎ সেই পুরাতন গৃহদ্বয়ের মধ্যকার একটা প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেই মহম্মদ ছুটিয়া আসিয়া সেই বন্দিনীর হাত ধরিল আর কিছুমাত্র প্রশ্ন না করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল।

মহম্মদকে যেখানে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, সেটা সাধারণ কারাগার নয়, এক উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি কারাকক্ষ, কাহার জন্য এবং কিজন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ম্মাতাই বলিতে পারেন। সেখানে আশে পাশে কোন গ্রাম বা বসতির চিহ্ন নাই। আর সে ধার দিয়া মানুষও প্রায় চলা ফেরা করে না—রাজার নিষেধ আছে বলিয়াই হউক, কিম্বা অনেক নির্দ্দোষ প্রাণ সেখানে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়াই হউক।

এখানে নিরপরাধ বন্দীদিগকেই বোধ করি আবদ্ধ রাখা হইত ; নহিলে মহম্মদ আর এই রমণীকে এত কারাগার থাকিতে এখানেই বা বন্দী করা হইয়াছিল কেন ?

কিন্তু সে যে জন্যই হউক, সেদিন মহম্মদ যখন বন্দিনীকে লইয়া বাহিরের প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও পৃথিবী অল্প অন্ধকারে আবৃত ছিল, তখনও ধরিত্রী ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল ; কিন্তু সেই অর্দ্ধ স্বচ্ছ অন্ধকারে, সেই কম্পিতা ধরিত্রীর উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া মহম্মদ সেদিন যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার ভয়ও বিস্ময়ের আদি অন্ত রহিল না।

এমনই একখানি তরুণ মুখ সে যে ভারতবর্ষ প্রবেশ মুখেই দেখিয়া আসিয়াছে তাহা যেমন তাহার অন্তরের কাছে অবিদিত ছিল না, এই রমণী কে এবং কি সুত্রে সে এখানে বন্দিনী হইয়াছে তাহা ভাবিয়াও তাহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না।

তাহার উপরে এই রমণী আজ এত পীড়িত যে, আজ ইহাকে কারাকক্ষ হইতে বাহিরে আনা কিম্বা তাহার ভিতরেই ফেলিয়া রাখার কোন পার্থক্যই ছিল না।

কারণ সে আজ যে রাজ্যে যাইতে বসিয়াছে, সেখানে শত সহস্র আলাউদ্দিন লক্ষ লক্ষ লোহার শৃঙ্খল লইয়া গেলেও তাহার একটী কেশও স্পর্শ করিতে পারিবেনা।

কিন্তু মহম্মদ আজ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতে তাহার মুক্তির সম্ভাবনা কোন পথ দিয়া আসিবে, তাহা সে ভাবিয়াই প্রস্তুত ছিল না। এই পীড়িতা রমণীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও যেমন সম্ভবপর ছিল না, প্রহরীদের হস্তে পুনরায় বন্দী হওয়াও তেমনই অভিপ্রেত ছিলনা। অথচ এই উন্মুক্ত নির্জ্জন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া এই রমণীর মৃত্যু-দৃশ্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিবার মত মনের বল ও তাহার ছিলনা। কারাবাস কালে তাহার যে বুদ্ধিও সাহস সজীব ছিল, বাহিরে আসিয়া তাহা একেবারেই লোপ পাইল।

কিন্তু যাহার জন্য সে এতটা করিয়াছে, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিচয়টা লইবার জন্যই সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "রমণী তুমি কে?"

রমণী প্রান্তরে শুইয়া পড়িয়াছিল; সেইখান হইতেই মুখ তুলিয়া সে সগর্ব্বে বলিল "আমি আলাউদ্দিনের ধর্ম্মপত্নী, কৃষক কন্যা দরিয়া।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়ে মহম্মদ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কৃষককন্যা দরিয়া আলাউদ্দিনের ধর্ম্মপত্নী হইয়াও কতখানি দুর্ভাগ্য যে তাহাকে কারাগারে আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ভাবিয়াই সে অত্যন্ত করুণস্বরে জিজ্ঞাসা: করিল "বেগমসাহেব তোমার এ দুর্দ্দশা ক'র্লে কে?"

মেহেরবান্, আমি বেগম হই নাই, পাছে আমাকে বেগম করিতে হয় সেই ভয়েই আলাউদ্দিন আমাকে ষোল বৎসর কারারুদ্ধ করিয়াছে, আর—

"বুঝেছি বেগম সাহেব, তোমার প্রেমের পরিবর্ত্তে তুমি অপমানই পেয়েছ"—

দরিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "তবে শুন্‌বে মেহেরবান,: আমার দুঃখের কাহিনী, আর ব'লবার সময় নাই—তবু শোন।

ষোল বৎসর আগে এই আলাউদ্দিন প্রলোভন দেখিয়ে আমায় জয় ক'রেছিল—কিন্তু যেদিন আমার দেহে তা'র স্বত্তা প্রকাশ পেল' সেদিন সে আমায় দূর ক'রে দিলে। কিন্তু আমি সম্রাটের কাছে বিচার প্রার্থনা ক'র্ব্বার ভয় দেখাতেই, সে আমায় কৌশলে বন্দী ক'র্লে; আর সবা'র বড় যন্ত্রণা এই যে, সে আমার শিশু কন্যাকে পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে। আর আমি আজ ম'র্ত্তে ব'সেছি, সংসারে আমার আত্মীয় ব'ল্‌তে কেউ নাই; আলাউদ্দিন আমার শিশু কন্যাকে পর্য্যন্ত হত্যা ক'রেছে।"

"না বেগম সাহেব, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তাহ'লে তোমার কন্যা মরে নাই; ভারতবর্ষ প্রবেশ মুখে আমি তা'কে জীবিত দেখে এসেছি।"

"মেহেরবান্ খোদা! মরিয়ম বেঁচে আছে?" বলিয়া অভাগিনী উত্তেজনায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মহম্মদ তাহাকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া বলিল "উত্তেজিত হ'য়োনা বেগম সাহেব, এখান থেকে যদি বেঁচে ফিরতে পারি, আমি তোমার কন্যার সন্ধান কর্ব্ব, সে আমার একবার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিল—আমি তা' ভুলি নাই।

দরিয়া আর কথা কহিতে পারিতে ছিল না। অত্যন্ত অস্পষ্ট-স্বরে বলিল "তাকে ব'লো সে যেন তা'র মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ

নেয়" বলিয়া দরিয়া চুপ করিল। আর এই সময় প্রহরীরা আসিয়া মহম্মদকে বন্দী করিতেই মহম্মদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল "স্থির হও যমদূত, এই হতভাগিনীকে শান্তিতে ম'র্ত্তে দাও।"

কিন্তু প্রহরীরা শুনিল না, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। যাইবার সময় মহম্মদ একবার চীৎকার করিয়া ডাকিল "বেগম সাহেব, দরিয়া—"

কিন্তু হায়! কেহই উত্তর দিল না। হতভাগিনী বেগমের প্রাণবায়ু বোধ হয় তখন ইহজগতের সমস্ত সম্পর্কই ত্যাগ করিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদ ইচ্ছা করিলে এই দুটা প্রহরীর গলা টিপিয়া দূর করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু কি একটা অস্বাভাবিক প্রেরণায় তাহার অন্তর এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কঠোর শাস্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জানিয়াও সে তাহার দণ্ডদাতার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই ইচ্ছা করিল, মহারাজ পুরু যেমন করিয়া বিজয়ী সেকন্দার সাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, মৃত্যুর আদেশ শুনিবার জন্য।

মহম্মদ কল্পনা করিয়াছিল যে, দরবার কক্ষে অসংখ্য পারিষদের সম্মুখে, তাহার বিচার হইবে, সাধারণ অপরাধীর মত। কিন্তু তাহাকে যখন ক্ষুদ্র এক গুপ্ত বিচার কক্ষে আনা হইল, আর সে একাকী আলাউদ্দিনকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইল, তখন মহম্মদ শুধু কতকটা নিরুৎসাহই হইল না, এই কূট বুদ্ধি

সম্রাটের অন্তরে আরও বিশেষ কি কল্পনা আছে তাহাও সে স্থির করিতে পারিল না, শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল সম্রাটের আদেশ শুনিবার জন্য।

কিন্তু সম্রাট যখন গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, মহম্মদের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগ আছে, সে শুধু কারাগারের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়নের চেষ্টাই করে নাই, সে এক বন্দিনীকে হত্যা করিয়াছে। তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া মহম্মদ বলিল "সম্রাট, আমি আপনার প্রজা নহি, আমি পারস্য সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা। আমাকে অযথা বন্দী করিয়াছেন শুনিলে পারস্যের সম্রাট ক্ষুব্ধ হইবেন সেটা স্মরণ রাখিবেন। আর আমার নামে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, আমি তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া সম্রাটের নামেই অভিযোগ আনিতেছি যে, সম্রাট স্বয়ং সেই নারীকে হত্যা করিয়াছেন। সম্রাট স্বয়ং অবোধ কৃষক কন্যার দেহও মনের উপর যথেচ্ছাচার করিয়া ষোল বৎসর তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাহাকে তিল তিল করিয়া হত্যা করিয়াছেন। সম্রাট নিজ ঔরসজাত শিশুকন্যাকে—

মহম্মদ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এই সময় তরবারীর ঝনৎকার শুনিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল,

দুইজন ভীমকায় অস্ত্রধারী পুরুষ তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় তাহাকে সেই দেশে লইয়া যাইবার জন্য যেখান হইতে আর কেহই জীবিত ফিরিবে না। বোধ হয় তাহারা আলাউদ্দিনের একটি মাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিল। তবুও মহম্মদ বিচলিত না হইয়াই বলিল "হাঁ, সম্রাট্ আপনার ঔরসজাত কন্যাকে বিরাট বিশ্বের অজ্ঞাত অন্ধকারে নিক্ষেপ ক'রেছেন—পাছে সে একদিন আলোকে এসে আপনার সত্যকারের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ ক'রে দেয়। হতভাগিনী দরিয়া মৃত্যুর আগে একথা আমায় ব'লে গিয়েছে।" কিন্তু এই সময়েই মৃত্যুর গ্রাসের মত প্রহরীদের হাত আসিয়া মহম্মদের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল, আর অপ্রয়োজনেও অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করিয়া বোধ হয় নরলোকের যমপুরীর দিকেই টানিয়া লইয়া চলিল।

কিন্তু দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ে মহম্মদ দেখিল যে এক বৃদ্ধা রমণীর হাত ধরিয়া সেখানে যে দাঁড়াইয়া আছে, সে হতভাগিনী দরিয়ার কন্যা সেই বন-বাসিনী মরিয়ম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাবিয়া যেদিন মহম্মদের পরিবর্ত্তে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে লইয়া কুটীরে ফিরিল, সেদিন তাহার মাতা শয্যাত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, বিস্ময়ে কি আনন্দে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিলনা।

এই সুন্দরীকে সে কখনও দেখে নাই সত্য, কিন্তু এ যে কোন রাজকন্যা হইবে—তাহা বোধ হয় সে রূপ দেখিয়াই স্থির করিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে কতকটা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াই সুন্দরীর পদতলে প্রণত হইল—বোধ হয় তাহার রূপের অর্চ্চনা করিতেই।

কিন্তু সুন্দরী যখন হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল যে, সে কোন রাণী বা রাজপুত্রী নহে, অরণ্যে বাস করিয়া সে

এত বড় হইয়াছে এবং সে কে, কোথা হইতেই বা এই অরণ্যে আসিয়াছিল, তাহাও সে জানেনা, তখন সহসা এই বৃদ্ধার মনে একটা বহুদিনকার পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, এবং প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে যতটুকু দেখা যাইতেছিল তাহাতেই লক্ষ্য করিয়া সহসা সে এই অরণ্য-বাসিনীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া এমনই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল যে তাহার কারণ কি এবং কোনখানটায় তাহা না পারিল বুঝিতে রাবিয়া, না পারিল এই সুন্দরী ; শুধু ভয়ে বিস্ময়ে তাহারা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু তাহাদের এই স্তব্ধভাব তখন কাটিল, যখন বৃদ্ধা মরিয়মের গলার পদকটা দেখাইয়া বলিল যে, সে স্বহস্তেই এই পদকটা মরিয়মের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, আর মরিয়মের অভাগিনী মাতার প্রসবকালে সেই ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিল—আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, আর দস্যু আসিয়া শৈশবেই মরিয়মকে চুরি করিয়া লইয়া না যাইত, তাহা হইলে এই মরিয়ম আজ বাদসাহের অন্দরমহল কিরূপ আলোকিত করিত, তাহাই ভাবিয়া বৃদ্ধা পুনরায় ক্রন্দন আরম্ভ করিল।

কিন্তু তাহার জীবন যে কতখানি রহস্যময়, আর কিরূপেই বা সে বাদসাহের অন্দর মহলে স্থান পাইতে পারিত, তাহাই জানিবার জন্য মরিয়ম যখন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, তখন বৃদ্ধা

একে একে তাহাকে সমস্ত কাহিনী গুলাই শুনাইয়া দিল। কিরূপে তাহার স্বর্গীয়া জননী আলাউদ্দিনের প্রলোভনে পড়িয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিল—কিরূপেই বা আলাউদ্দিন দস্যু দিয়া তাহার শিশু কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়া রজনীর অন্ধকারে তাহার স্বর্গীয়া মাতাকে লুকাইয়া রাখিল, আর মরিয়ম রাজকন্যা হইয়াও চিরদিন অরণ্যে পালিত হইয়া আসিতেছে—কিরূপেই বা দুষ্ট সম্রাট শেষে নিরপরাধী মহম্মদকেও কারারুদ্ধ করিয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত আশা ভরসাই বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে জানাইয়া সে যখন বলিল যে সেই বিদেশী সৈনিক সেদিন না আসিলে তাহারা মাতা পুত্রীতে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত—তখনই মরিয়ম বুঝিতে পারিল, এই সেই বিদেশী সৈনিক যাহাকে সে রাজপুতানায় আসিতে বলিয়াছিল, আর যাহার সন্ধানে সে এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মহম্মদের সন্ধানে আসিয়া মরিয়ম নিজের যে নূতন সন্ধান খুঁজিয়া পাইল, তাহাতে তাহার বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কারণ যতখানিই থাকুক, অন্তরে আর উৎসাহের কোন সাড়াই রহিল না, কারণ প্রথম যেদিন সে মহম্মদকে দেখিয়াছিল, দেখিয়া তাহার অরণ্যবাসী প্রাণটার ভিতরে একটা নূতন সজীবতার আস্বাদ অনুভব করিয়াছিল, আজ এতদিন পরে সহসা সে স্বপ্ন

ভাঙ্গিয়া যে কর্ম্মের আহ্বান ভাসিয়া আসিয়া তাহার অন্তর দ্বারে প্রতিহত হইতে লাগিল, তাহাকে সে ঠেকাইয়া রাখিবেই বা কি দিয়া, অথচ সে কাজ সম্পন্ন করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহার অন্তরে বাহিরে সে শক্তিই বা কোথায় ?

অথচ তাহার মাতার এই অপমান, এই মৃত্যু, কন্যা হইয়া সে সহ্য করিতে শিখে নাই। প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার অরণ্য-পুষ্ট শোণিত প্রবাহ অন্তরে অন্তরে গর্জ্জিতে লাগিল। কিন্তু একটা জিনিষের অভাব হইতেছিল, সেটা মহম্মদের। মরিয়ম একাকীই বোধ হয় সব কার্য্য করিতে পারিত—পারিতনা কেবল আত্ম রক্ষা করিতে। প্রতিহিংসায় সে যতই ক্ষিপ্ত হউক কিম্বা অপমানে সে যতই উত্তেজিত হউক, তাহার এই দেহটা যে নারীর, তাহাত' তাহার কাছে অজ্ঞাত ছিলনা। উত্তেজনায় অপমানে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারে, কিন্তু আকণ্ঠ জলে গিয়া পড়িলে উদ্ধার করিবার জন্য যে সবল বাহুর প্রয়োজন তাহাত' তাহার ছিল না।

ভগবান নারীর হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন বোধ হয় কোমল মৃত্তিকা দিয়া। তাহাতে একটু মাত্র জল দিলে সে গলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু যদি কোন রকমে অগ্নি স্পর্শ করে তাহা হইলে মুহূর্ত্তে সে পাষাণে পরিণত হয়। নহিলে বিজন-বাসিনী

মরিয়ম যে আজ ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চলিয়াছে, সে কাহার বলে।

কিন্তু সে যাহাই হউক, মরিয়মের এই ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য সে তখনই ঝাড়িয়া ফেলিল, যখন তাহার ধাত্রীমাতা তাহার পদক খুলিয়া আলাউদ্দিনের পত্র আর তাহার সঙ্গে তাহার জননীর লিখিত পত্রটুকুও বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। সে পত্রে কি শক্তি নিহিত ছিল, তাহা সেই বলিতে পারে, কিন্তু সেই একটী মাত্র সূত্র ধরিয়াই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মরিয়ম তাহার মাতার অপমানের প্রতিশোধ লইতে আর সেই সঙ্গে মহম্মদকেও মুক্ত করিতে প্রস্তুত হইল।

...তুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মরিয়মকে যেদিন তাহার মাতৃক্রোড় হইতে দস্যুরা কাড়িয়া লইয়া যায়, সেদিন আলাউদ্দিনের আদেশ মতই তাহাকে রাজপুতানার পরপারে দূর পার্ব্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রাখা হয়।

কিন্তু গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া একজন দস্যু চলিয়া আসে, অপরজন বোধ হয় স্নেহের প্রভাবেই সেইখানে থাকিয়া যায়, আর এই মাতৃপিতৃহীন শিশুর পালনের ভার বোধ হয় বিধি নির্দ্দেশেই গ্রহণ করে। আলাউদ্দিনের আদেশমতই মরিয়মকে পালন করিবার জন্য তাহারা একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়াছিল। সেই ধাত্রীই দস্যুর অজ্ঞাতে মরিয়মকে অল্প অল্প শিক্ষা দিয়া তাহার ভিতরকার নারী প্রবৃত্তিটাকে কতকটা সজাগ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ধাত্রীর মৃত্যুর পর তাহার অর্দ্ধসুপ্ত নারী-হৃদয়টা যেদিন পরিপূর্ণ জাগরণ লাভ করিল, আর এই দস্যুসঙ্গ পরি-

হারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় যেদিন নূতন গৃহের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সেইদিন আসিল মহম্মদ, মরিয়মের হৃদয় দুর্গে ভেরীর ভৈরব নিনাদ করিতে। আর যখন সে চলিয়া গেল — সে শুধু দুর্গ জয় করিয়াই গেল না—পশ্চাতে তাহার মোহন মূর্ত্তির জয় পতাকা পুঁতিয়া রাখিয়া গেল।

কিন্তু এই বৃদ্ধ দস্যুও মরিয়মের উপর তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিয়াছিল। মহম্মদকে বাঁচাইবার আগ্রহ দেখিয়াই সে সেদিন মরিয়মকে বন্দী করিয়াছিল। পাছে সে তাহার চিরপরিচিত অরণ্য ছাড়িয়া একেবারে গৃহস্থের ঘরে আসিয়া দেখা দেয়।

কিন্তু সেদিন তাহার প্রাণ ছুটিয়াছিল আলোকের পথে। তাই মরিয়ম সমস্ত বাধা বন্ধন বিদলিত করিয়া চিরপরিচিত অরন্যানীর বন্ধুকৃত গুল্মলতার বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া নগরে ছুটিয়া আসিল। আর আসিল ঠিক সেই মূহুর্ত্তে, যখন আলা-উদ্দিনের হস্তে মহম্মদ বন্দী হইয়াছে।

মরিয়মের হৃদয় ছুটিয়াছিল নগরের পথে, আর মহম্মদ যেদিন বন্দী হয়—সেদিন তাহারও অন্তর ছুটিয়াছিল অরণ্যের পথে। মানুষের অকৃতজ্ঞতা, শত্রুতা দেখিয়া তাহার হৃদয় এতই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেদিন সে লোকালয় হইতে যমালয়কেই বেশী পছন্দ করিতেছিল। কিন্তু আকাঙ্খিত মিলন তাহাদের,

গন্তব্য পথের মধ্যে হইল না। হইল বোধ হয় অন্তরে— আর বাহিরে তাহারা উভয়েই বন্দী হইল—মহম্মদ শত্রুর হস্তে, আর মরিয়ম শত্রু-দলন কর্ত্তব্যের হস্তে।

দরিয়াকে আলাউদ্দিন যে পত্র দিয়াছিল, তাহা যেদিন তাহার হস্তগত হইল, সেদিন মরিয়ম প্রতিশোধ লইতেই ছুটিয়াছিল, ভাবে নাই যে মাতার প্রতি এই কর্ত্তব্য দুদিনেই শেষ হইয়া যাইবে না। এই কর্ত্তব্য কঠোর বেষ্টনে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবে। তাই সে যখন দেখিল যে আলাউদ্দিন তাহার মাতাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছে !—

দরিয়া,

তোমার পত্র পাইলাম। রাজধর্ম্মের অনুরোধে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না—কিম্বা তোমার কন্যাকে স্বীয় কন্যা বলিয়া প্রকাশ্যে গ্রহণ করিতে পারি না। তবে আমার ঔরসজাত কন্যা যাহাতে দুরবস্থায় পতিত না হয়, তাহার জন্য আমি বৎসরে পাঁচশত আসরফি করিয়া পাঠাইব। আশা করি, ইহাতেই তুমি সন্তুষ্ট হইবে।

আর একখানি ক্ষুদ্রপত্রে তাহার মা লিখিয়াছে—

অভাগিনী কন্যা আমার—

যদি জীবিত থাকিয়া আমার পত্রপাঠ করিবার অবসর পাও

তাহা হইলে তোমার মাতার অপমানের প্রতিশোধ তুমি লইও। তোমার হতভাগিনী গর্ভধারিণীর এইমাত্র আদেশ তোমার উপরে রহিল।"

তখন অভিমানে, অপমানে, উত্তেজনায় মরিয়ম ছুটিল রাজদ্বারে—তাহার মাতার মত বিচার প্রার্থনা করিতে নয়, অপরাধীর বিচার করিতে। আর সেই উদ্দেশ্য লইয়াই সে যখন আলাউদ্দিনের বিচার কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, ঠিক সেই সময়েই মহম্মদ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া চিরমুক্তির পথে যাইতে আদিষ্ট হইয়া বিচার কক্ষের বাহিরে আসিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু বিচার কক্ষের বাহিরে আসিয়াই সম্মুখে মরিয়মকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, মহম্মদ যতখানি না বিস্মিত হইয়াছিল, তত বিস্মিত হইয়াছিল এই যমদূতের মত প্রহরী দুটা।

কিন্তু তাহাদের এই বিস্ময় বোধ করি, সমস্ত বিস্ময়কেই ছাপাইয়া উঠিল, যখন মরিয়ম বিনা বাক্যেই মহম্মদের হাতটা ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল "সম্রাট, আমার মা কোথায় ?"

সম্রাট্ তখন আসন ছাড়িয়া অন্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে এত রূঢ়, অথচ এত কোমল, দৃপ্ত অথচ হৃদয়স্পর্শীস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিল, তাহাই দেখিবার জন্য তিনি পশ্চাৎ ফিরিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়াই দেখিলেন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী।

সুন্দরীর অধরে হাস্য নাই, নয়নে কটাক্ষ নাই, ভ্রূতে ভঙ্গিমা নাই তথাপি সুন্দরী অপূর্ব্ব সুন্দরী। সুন্দরীর বসনে বিলাস নাই, দশনে বিকাশ নাই, বাহুতে কঙ্কন নাই, অঙ্গে অলঙ্কার চিহ্ন-মাত্র নাই, তথাপি সুন্দরী, অপূর্ব্ব সুন্দরী। সুন্দরী কিশোরী নহে, যুবতী নহে, প্রৌঢ়াও নহে, তাহার বচনে বিন্যাস নাই, গমনে ভঙ্গিমা নাই, রঞ্জিত চরণ নাই, তথাপি সুন্দরী অপূর্ব্ব সুন্দরী।

দেখিলেন সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছে তাঁহারই গৃহতলে, তাঁহারই সম্মুখে, মহম্মদের করস্পর্শ করিয়া, মূর্ত্তিমতী মুক্তির মত শৌর্য্যানুবর্ত্তী স্নেহের মত—উন্নত, অবিকম্পিত, প্রশান্ত অথচ প্রদীপ্ত প্রদীপ শিখার মত। স্নিগ্ধ, গর্ব্বিত, অথচ বালারুণ-করস্পর্শে প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পের মত। তাহার আননে মহিমা, নয়নে করুণা, অঙ্গ ভঙ্গিতে ঝটিকা, সে দৃপ্ত অথচ শান্ত, আরণ্য অথচ সৌন্দর্য্যময়ী, অরক্ষিতা, নির্ব্বাসিতা, তথাপি সাম্রাজ্য-শাসন-শক্তিমতী।

কিন্তু এ সৌন্দর্য্য দেখিয়া সম্রাট্ সুখী হইতে পারিলেন না। এই দৃপ্ত, গৌর, রবিকরোজ্জ্বল সজল জলদের মত, তাহারই মত স্থির তাহারই মত অর্থপূর্ণ এই রূপ, স্নিগ্ধ অথচ প্রখর-কিরণ-বর্ষী, নম্র, অথচ ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি যেন তাঁহার বহুদিনকার অপরাধের

দণ্ড দিতে আজ শাসকের মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে। পার্শ্বে তাহার মহম্মদ, সেই বিস্তৃত বক্ষ: শালপ্রাংশু মহাভুজ বন্দী, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তথাপি নির্ভীক, অকম্পিত উত্তেজিত অথচ হাস্যময় জয়ের গৌরবময়, দাঁড়াইয়া আছে বোধ হয় তাহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই।

এ মূর্ত্তি দেখিয়া সম্রাট মুগ্ধ হইলেন স্তব্ধ, হইলেন ভীত হইলেন। এ মূর্ত্তি যে কাহার বিগত আত্মার রুষ্ট প্রতিবিম্ব তাহাত' তাঁহার অন্তরের কাছে অপরিচিত ছিল না। তিনি দেখিলেন দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ পরে কৃষক কন্যা দরিয়ার অভিশাপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিচারকের বিচার করিতে আসিয়াছে। তথাপি তিনি সম্রাটের মতই জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি বালিকা ?"

"কে আমি ? চিন্‌তে পারেন কি সম্রাট্ ?" বলিয়া মরিয়ম যে পত্রখানি বাহির করিয়া সম্রাটের সম্মুখে ধরিল—তাহা দেখিয়াই সম্রাট্ দুইপা পিছাইয়া গিয়াই সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাও বালিকা ?"

"কি চাই ?" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মরিয়ম বলিল "আমার মাকে ফেরত চাই, দিতে পার্ব্বেন সম্রাট ?"

তাহার এই অস্বাভাবিক হাস্য দেখিয়া সম্রাট্ চমকিত

হইলেন—আর তাঁহারই নিভৃত বিচার কক্ষে আজ কিসের অভিনয় হইতে চলিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "তোমার মাতা এখন সম্রাটের হাতের বাহিরে। তোমার মাতার মৃত্যু হ'য়েছে।"

"এ মৃত্যু তা'কে কে দিয়েছে সম্রাট?" বলিয়াই সহসা সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল "কিন্তু তা'র মৃত্যুর বিনিময়ে আপনি কি দিতে পারেন সম্রাট?"

কতকটা ভীত হইয়াই আলাউদ্দিন জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাও তুমি?"

"প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ চাই—দিতে পার্ব্বেন সম্রাট্?"

সম্রাট্ প্রাণ দিবেন কি, একটা ক্ষুদ্র অপরিচিতা বালিকার মুখে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তিনি শুধু স্তম্ভিতই হইলেন না—পরম ভীত হইলেন। কারণ তাঁহার অপরাধ যে কত বড় তাহা তিনি আজই প্রথম বুঝিতে পারিলেন। আর বুঝিলেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি সম্রাট্ হইয়াও আজ এক বন্য বালিকার কাছে অপদস্থ হইলেন। আর উত্তেজনায় অপমানে, বিগত পাপ স্মরণে তিনি প্রায় কম্পিত স্বরেই জিজ্ঞাসা করিলেন "বালিকা! কা'র সঙ্গে কথা ক'চ্ছ জানো?"

মরিয়ম তেমনই উত্তেজিত স্বরে বলিল "জানি পাঠান সম্রাট্

আলাউদ্দিনের সঙ্গে। যিনি এক অসহায়া কৃষক কুমারীকে ছলে ভুলিয়ে, তার সর্ব্বনাশ ক'রে, শেষে তাকে বন্দী ক'রে হত্যা ক'রেছেন। যিনি এক নিরপরাধী বিদেশী সৈনিককে বন্দী ক'রে শেষে হত্যা ক'র্‌বার মানস ক'রেছেন। যিনি—" বলিয়া মরিয়ম আরও কি বলিতে যাইতেছিল।

সহসা আলাউদ্দিন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "কে আছ? এই ক্ষিপ্তা সিংহিনীকে এখান থেকে নিয়ে যাও।"

আদেশ শুনিয়া প্রহরী অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু মহম্মদ এই সময় সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "সাবধান সম্রাট্‌, মরিয়মের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'লে, তা'র কৈফিয়ৎ শুদ্ধ প্রহরীকেই নয় আপনাকেও দিতে হবে।" বলিয়া মরিয়মকে রক্ষা করিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইল যে, সম্রাট্‌ কতকটা ভয়েই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বিদ্রোহ, বিদ্রোহ, কে আছ' বন্দী কর হত্যা কর।"

কিন্তু তাঁহার আদেশ দান শেষ হইবার আগেই মহম্মদ একলম্ফে প্রহরীর কোষ হইতে তরবারী বাহির করিয়া আনিয়া অচল পর্ব্বতের মত সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "সম্রাট্‌ আদেশ প্রত্যাহার করুন, আদেশ প্রত্যাহার করুন সম্রাট্‌—নৈলে—"

কিন্তু এই সময়ে সেনাপতি মালিক কাফুর সেই কক্ষে

প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়াই মহম্মদ পুনরায় বলিয়া উঠিল "আদেশ প্রত্যাহার করুন সম্রাট্।

সম্রাট্ তখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সম্মুখে সেনাপতিকে দেখিয়া তিনি তাহার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই, মহম্মদ তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া সম্রাটের মস্তকের উপর সেই তরবারী উঠাইল, আর ঠিক সেই মূহূর্ত্তেই মরিয়ম আসিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল "হত্যা ক'রনা মহম্মদ।"

মহম্মদ উদ্যত তরবারী নামাইতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে মালিক কাফুরের তরবারী আসিয়া তাহাতে প্রতিহত হইল, আর মহম্মদ পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই মহম্মদের স্কন্ধে আঘাত লাগিয়া শোণিতক্ষরণ হইতে লাগিল। কিন্তু মহম্মদ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তরবারী ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল "মরিয়ম, তোমার জন্যই আমি রূঢ় হ'য়েছিলাম। সম্রাট্, আমায় বধ করুন। হতভাগিনী দরিয়া আর আপনার কন্যা মরিয়মের উপর অত্যাচার দেখেই আমি আপনার স্কন্ধে তরবারী তুলে ছিলাম—নহিলে সম্রাটের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন শত্রুতা নাই—আমি রাজনীতি কতক বুঝি।"

কিন্তু সেনাপতির সম্মুখে আজ মহম্মদ যে কথা বলিয়া ফেলিল—তাহাতে সেনাপতির মনের ভাবটা কিরূপ হয় তাহাই জানিবার জন্য বোধ হয় সম্রাট তাহার মুখের দিকে চাহিলেন—চাহিয়াই ডাকিলেন—"কাফুর"

কাফুর তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াই বলিয়া উঠিল 'জাঁহাপনা! অকালে এ পুষ্প নষ্ট না ক'রে দেবগিরি জয়ের উপহার স্বরূপ এ পুষ্প আমার হাতে অর্পণ করুন। আমি তা'কে আমার অন্তঃপুরে বন্দী ক'রে রেখে দেব'—সংসার-এর অস্তিত্ব জান্‌তে পার্ব্বেনা।"

সম্রাট ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বহুৎ আচ্ছা কাফুর, আমার এই বনবাসিনী কন্যাকে আমি তোমার হাতেই দিলাম—অন্তঃপুরে তা'কে সম্মানে রেখো—স্বাচ্ছন্দ্যে রেখ।' এই কথা বলিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা মহম্মদের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার কাগজের মত সাদা মুখখানা দেখিয়া তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিলেন "আর মহম্মদ যাও আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

কিন্তু তখন যে তাহার আর কোন মুক্তিই প্রার্থনীয় ছিল না তাহা বোধ হয় সম্রাট্ বুঝিতে পারিলেন না। পারিলে, এই বিচার কক্ষে দাঁড়াইয়াই মহম্মদের মুণ্ডচ্ছেদ করিবার আদেশ দিয়া

তিনি পরম করুণার কার্য্য করিতেন। মহম্মদ একবার মরিয়মের দিকে চাহিল কিন্তু সে তখন নতমস্তকে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া তাহার মুখের কোন অংশই দেখা গেল না।

নৈরাশ্যে মরিয়া হইয়া মহম্মদ ডাকিল সম্রাট্‌।

কিন্তু সম্রাট্‌ তখন চলিয়া গিয়াছেন।

বাহিরে আসিয়া মহম্মদ বোধ হয় শেষ দেখা দেখিয়া লইবার জন্যই একবার মরিয়মের দিকে চাহিতেই সে ম্লান হাসিয়া বলিল "মহম্মদ, আমার এই আজীবন দাসত্বের কতদিনে শেষ হবে তা' জানিনা। কিন্তু সে যবেই হউক—তুমি দেশে যদি কখনও ফের', ফেরবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেও, মহম্মদ তোমার কাছে আমার এই শেষ মিনতি রইল।" বলিয়াই বোধ হয় উচ্ছ্বসিত অশ্রু রোধ করিবার জন্যই সে ঘাড় হেঁট করিয়া দ্রুতপদে কাফুরের অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল। আর মহম্মদ সেই অগণ্য প্রহরী-বেষ্টিত রাজপুরীর মধ্যেও যেন সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে রাবিয়ার মাতার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিল—আসিয়াই যে দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করিল, সেইদিকেই উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধাতা যদি মানবের ক্ষুধাতৃষ্ণার সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মহম্মদের এই দ্রুতগমন প্রবৃত্তির কখনও শেষ হইতনা। কিন্তু সবে মাত্র কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া, এত বড় একটা বিচার কক্ষের উত্তেজনাও অবসাদ বক্ষে পুরিয়া লইয়া, আহত দেহ ও মনকে বহিয়া দিল্লীর মত একটা নগর অতিক্রম করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লইতে, মানুষের দেহ ধরিয়া কেহই পারেনা, তাই প্রায়-মূর্চ্ছিত দেহটাকে টানিয়া আনিয়া মহম্মদ যখন একটা সরাইখানার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে।

ভিতরে তখন আহারার্থীর মেলা বসিয়া গিয়াছে। তাহাদের আনন্দ কোলাহল আর অর্থশূন্য গল্পগুজবের মধ্যে নিজের সমস্ত

চিন্তাকে ডুবাইয়া দিয়া সহরের যত কিছু সম্ভব ও অসম্ভব কাহিনীকে হৃষ্টমনে সম্ভোগ করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না বলিয়াই হউক, কি মানবের নিঃশ্বাস সংস্পর্শ সেদিন তাহার ভাল লাগিতে ছিল না বলিয়াই হউক, মহম্মদ দূরে একটা কোণে আসিয়া একটি আসন অধিকার করিয়া নির্জ্জীবের মত চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিল। আর যতক্ষণ না সরাইখানার ভৃত্য আসিয়া তাহার খাদ্য পানীয়ের কিরূপ আয়োজন করিবে তাহার আদেশ প্রার্থনা করিল, ততক্ষণ সে চক্ষুই খুলিল না।

কিন্তু ভৃত্যকে আদেশ দিয়া বিদায় করিবার পরই সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, সে সবে মাত্র আজ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং তাহার নিকট এমন একটি কপর্দ্দক পর্য্যন্ত নাই, যাহা দিয়া সে একগ্রাস আহারের সংস্থান করিতে পারে। কিন্তু তখন আদেশ প্রত্যাহার করা কিংবা সে স্থান পরিত্যাগ করা এত অসম্ভব হইয়া পড়িয়া ছিল, যে তাহার কোনটা কার্য্যে পরিণত করা শুদ্ধমাত্র অভদ্রোচিত নয়, অত্যন্ত অপরাধের আকার লইয়া দাঁড়াইবে। তাই যাহা হয় হইবে ভাবিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, আর খাদ্য পানীয় আসিয়া উপস্থিত হইলে বিনা বাক্যেই তাহা উদরস্থ করিয়া লইল। সেদিন

তাহার অবসন্ন দেহে আর ততোধিক অবসন্ন মনটার উপর চিন্তার রেখাপাত সুতীক্ষ্ণ বেত্রাঘাতের মতই এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভবিষ্যতের চিন্তা করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ বর্ত্তমানের ঘটনাগুলা তাহার চিন্তা শক্তিকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়াই রাখিয়াছিল।

তারপর আসিল সন্ধ্যা; সুনীল অম্বর হইতে রক্তাম্বর পরিয়া অতিধীরে অতি সন্তর্পণে শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য, জননীর মত অতি সাবধানে তাহার বাহু বিস্তার করিয়া অম্বরে, নগরে, ধরিত্রীর অর্দ্ধেক অঙ্গে প্রদীপ জ্বালাইয়া, আহত মলিন শোকাচ্ছন্নকে শান্তির প্রলেপ দিতে, আর্ত্ত, মুমূর্ষু, অভিশপ্তকে নিদ্রায় সান্ত্বনা দিতে, বিলাসীর গৃহপ্রাঙ্গণ বিলাস উৎসবের পঙ্কিল কামনায় অভিসিঞ্চিত করিয়া দিতে। আর আসিল নগরীর বক্ষে অসংখ্য আলোক লেখা, মহম্মদের নিভৃত হৃদয়-কন্দরে দুঃখের অস্পষ্ট লেখাগুলা আলোকোজ্জ্বল করিয়া দিতে।

কারণ ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মহম্মদের মনে পড়িয়া গেল যে, আজ দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার প্রদীপ লইয়া বনবাসিনী মরিয়ম আর একজনের গৃহ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছে, গৃহস্বামীর কল্যাণ কামনা করিতে, আর সে গৃহ যাহারই হউক, মহম্মদের

নয়, কখনও হইবে না ; মনে পড়িল যে, গৃহহারা মহম্মদ কোনদিন গৃহের আস্বাদ পাইবে না—সে যাহা পাইবে তাহা অনন্ত অপরিচিত পথের ধূলিকণা মাত্র। নহিলে, সে আজ প্রথম যৌবনেই যোগী সাজিয়া স্বদেশ হইতে এতদূরে দিল্লীর এক সরাইখানার নিভৃত কক্ষে পড়িয়া আছে কেন? যখন সমস্ত পৃথিবী তাহার আনন্দ কোলাহল,উৎসবের সঙ্গীত গাহিয়া তাহারই সম্মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী দর্শকের চক্ষে সমুদ্রের অনন্ত লহরী লীলার মত। আর সে বসিয়া আছে সেই সমুদ্রতীরে—জনসমুদ্রের অগণিত আনন্দ উচ্ছ্বাস তাহার চক্ষে কর্ণে আসিয়া প্রহত হইতেছে, অন্তরে প্রবেশ করিতেছেনা—নিয়ত তাহাকে দূরেই ঠেলিয়া রাখিয়াছে! মনে পড়িল তাহার কৈশোর প্রেমের বিফল প্রয়াস, মনে পড়িল রোশেনার সেই সজল করুণ দৃষ্টি ; বিদায় মুহূর্ত্তে যাহা কতই না বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া মহম্মদের হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল—কত সকরুণ মিনতির আবেদন জানাইয়া মহম্মদকে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছিল। আর মনে পড়িল মরিয়মের বিদায় দৃশ্য, সেই শান্ত গম্ভীর সজল প্রোজ্জল চাহনি, নির্ভীক অথচ উৎকণ্ঠিত, দৃপ্ত, সংযত, অথচ মেঘমুক্ত অম্বরের মত। আর বেদনায়, যাতনায়, নৈরাশ্যে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতে লাগিল এই ভাবিয়া যে, নিষ্ঠুর বিধাতা

একটা মানুষের স্কন্ধে এতগুলা পরাজয় চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে কাল কাটাইতেছেন কি করিয়া? যখন মানুষ সেই পরাজয়ের ভারে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। কি অপরাধ করিয়াছিল এই মহম্মদ, যে তাহাকে নিরন্তর এই পরাজয়ের মধ্য দিয়াই যাইতে হইতেছে—যখন তাহার চতুর্দ্দিকে সহস্রলোক সহস্র কর্ম্মের জয় পতাকা তুলিয়া, চলিয়াছে আলোকের পথে, আলোককেই অভিনন্দন করিতে, কি আলোক স্রষ্টার জয় ঘোষণা করিতে। আর সে একাকী এতদূরে আহত মলিন, শোণিত-ক্ষরণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া আছে—এই বা কাহার পাপে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতে যখন মহম্মদের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সূর্য্যালোক গৃহপ্রবেশ করিয়াছে. আর সেই সূর্য্যালোকে সেদিনকার সমস্ত কার্য্যই যখন তাহার চক্ষের উপর স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখনই সে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। আর সেই মূহুর্ত্তেই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, এইবার সরাইওয়ালা তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে আসিবে। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিবার মত কোন অর্থই তাহার কাছে নাই, অথচ কি দিয়া তাহাকে বিদায় করিবে, তাই ভাবিয়াই সে যখন আকুল হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়েই সহসা তাহার হাতের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে

পাইল যে তাহার হাতে তখনও একটা মূল্যবান আংটী আছে। আর সেইটা দিয়াই ঋণ পরিশোধ করিবার কল্পনা করিয়া কথা গুলা কি ভাবে বলা যাইতে পারে তাহাই যখন সে গুছাইয়া লইতেছিল—ঠিক সেই সময়েই দরজা ঠেলিয়া সে গৃহে যে প্রবেশ করিল, সে রাবিয়া।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদের বিস্ময় বোধ হয় অতিমাত্রায় ছাপাইয়া গিয়াছিল। কারণ সরাই-ওয়ালার পরিবর্ত্তে সে যাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিল—তাহার আগমন এত অপ্রত্যাশিত যে, এতক্ষণ সে যে কথাগুলা কল্পনা করিয়া সরাইরক্ষকের জন্য গল্প সৃষ্টি করিতেছিল—তাহা আগাগোড়া বিশৃঙ্খল হইয়াত' পড়িলই—মহম্মদ নিজেও একেবারে নির্ব্বাক প্রতিমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল—যেন সে যাহা চক্ষে দেখিতেছে তাহা সত্যও নয়, সম্ভবও নয়।

কিন্তু রাবিয়া - সেই হাস্যমুখী চঞ্চলা ভীলবালা প্রথমটা যতই স্তম্ভিত হউক, মহম্মদের বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া অল্পক্ষণ পরেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন মহম্মদের মুখে এই বিস্ময়-স্তব্ধ ভাবটা তাহার বিবেচনায় একান্তই হাস্যজনক হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহাকে হাসিতে দেখিয়াই মহম্মদের সমস্ত বিস্ময় ক্রোধে পরিণত হইল। কারণ ঠিক সেই সময়েই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, এই রাবিয়ার কৌশলেই সে এতদিন কারাবাস করিয়া আসিয়াছে—শুধু কারাবাসই করে নাই, তাহার সঙ্গে আরও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে এই ছলনার কি প্রয়োজন ছিল এবং কি কারণেই বা সেদিন সে বন্দী মহম্মদের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল, তাহা আজ এই বিদায়ের দিনে জানিবার সম্পূর্ণ আগ্রহ থাকিলেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি মহম্মদের হইল না। কারণ যত বড় শত্রুতাই সে সাধিয়া থাকুক, এই ক্ষুদ্র মেয়েটা তাহার কাছে এত তুচ্ছ যে তাহার কার্য্যের কৈফিয়ৎ লওয়াটাও মহম্মদের নিকট অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া বোধ হইল। সে মুখখানাকে যথা সম্ভব কঠিন করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, আর রাবিয়ার হাস্য-তরল চাহনিটা এই দৃষ্টির সম্মুখে এখনই কিরূপ বিকৃত হইয়া যাইবে তাহারই একটা কল্পিত চিত্র মনে মনে আঁকিয়া লইতে লাগিল।

কিন্তু রাবিয়ার চাহনির কোন বিকার সম্ভাবনা দেখা গেল না। সে তাহার হাস্য-মুখর মুখখানাকে যথাসম্ভব হাস্যময় রাখিয়াই বলিল "মেহেরবান্, আপনাকে যে আর দেখ্‌তে পাব তা'

আশাই করিনাই—আমার এখানকার চাকুরীটাই শুধু সার্থক হ'ল না—আজ আমার জীবনটাও সার্থক হ'য়ে গেল'। আপনার জন্ম আমার মা অনেক কেঁদেছিল—আর আমিও কেঁদেছিলাম—বলিতে বলিতে সে মহম্মদের পা দু'টা জড়াইয়া ধরিয়াই বলিয়া উঠিল "মেহেরবান্ ভগবান তোমার মঙ্গল করুন" বলিয়াই মহম্মদের মুখের পানে চাহিল। আর বিস্ময়ে, লজ্জায় হর্ষে মহম্মদ তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে গিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, রাবিয়ার এতক্ষণকার উচ্ছলিত হাস্য সহসা অশ্রু-তরল হইয়া ধারাকারে নামিয়া পড়িতেছে।

এই আশ্চর্য্য মেয়েটার অধিকতর আশ্চর্য্য প্রকৃতি যতই সে দেখিতেছিল, মহম্মদ যেন ততই বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার এই বিদায়ের দিনে আর সকলের সঙ্গেই সে কতকটা বোঝা পড়া করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু রাবিয়া যেন দিন দিন তাহার নিকট একটা আশ্চর্য্য রকম প্রহেলিকা হইয়া উঠিতেছিল। সে কখনও হাস্যোচ্ছলা, মৃদুগুঞ্জনময়ী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মত ভাসিয়া চলিয়া যায়, কখনও বা ভাবের বন্যা লইয়া প্রচণ্ড জল প্রপাতের মত একেবারে পদতলে আছাড়িয়া পড়ে। তাহার এই হাস্য, এই অশ্রু কখনও বা প্রাতঃসূর্য্যের কিরণোদ্ভাসিত বর্ষাপ্রভাতের মত স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল, কখনও বা নিদাঘ দিনান্তের

বিদায়োন্মুখ সূর্য্যকিরণের মত গাঢ়, ম্লান, ছায়াচ্ছন্ন। যেন জীবনে তাহার দুঃখ বা সুখ কিছুই নাই। যাহা আছে তাহা তাহারই, সম্পূর্ণ নিজস্ব, পরহস্তগত হইবার আশঙ্কাও নাই, পরিবর্ত্তনের আশাও নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে সে দেখিয়াছিল শীর্ণা তটিনীর মত, আজও সে তটিনীই আছে, শুধু জোয়ারের আগমনে কিছু উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী, অথচ গভীর অথচ সংযত।

রাবিয়া উন্মাদ ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু সে মহম্মদকে প্রায় উন্মাদ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাই বোধ হয় সে প্রকৃতিস্থ আছে কিনা তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য মহম্মদ সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়াই বলিল "যাক্ রাবিয়া, তোমার সঙ্গে যা'বার সময় দেখা হ'ল, ভালই হ'ল। তুমি ভাল ছিলে রাবিয়া?"
"হাঁ। কিন্তু আপনি ছিলেন না জানি। আমার জন্যই আপনাকে জেলে যেতে হ'য়ে ছিল।"

আবার সেই কথা রাবিয়া? মহম্মদ যে এই কথাই দুই বৎসর ধরিয়া নির্জ্জনে কারাকক্ষে বসিয়া ভাবিয়াছে—তর্ক করিয়াছে হাঁ ও না'র সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। আবার আজ বিদায় কালে সেই কথা তুলিয়া তাহার অপ্রকৃতিস্থ অন্তরকে অধিকতর অপ্রকৃতিস্থ করিতে চাও কেন? আজ যে সে তোমাদের সকলের

নিকট হতে বিদায় লইতে চায়—শত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত অন্তর লইয়া, পরাজয়ের স্মৃতি বক্ষে বহিয়া। আবার আজ তাহার পুরাতন ক্ষতে রক্তস্রোত বহাইতে চাও কেন? সে যে শুদ্ধ অন্তরেই বিদ্ধ হয় নাই, বাহিরেও যে শত্রুর তরবারী ক্ষতের রেখা দিয়াছে তাহার পরাজয়ের স্মৃতিকে চির-অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য। আর সে ভগ্নপ্রাণে, ক্ষুন্ন মনে বাহির হইয়াছে—সংসারের সমস্ত আত্মীয়ার বাহিরে, তাহার অনির্দ্দিষ্ট দূর প্রবাসে বাস করিতে কতকালের জন্য তাহারও নির্দ্দেশ নাই, কোন্ কার্য্যের জন্য তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু মহম্মদের মনের কথা বুঝিবার সম্ভাবনা বোধ হয় রাবিয়ার ছিল না। তাই সে বলিতেই লাগিল "হাঁ আমারই অপরাধে আপনাকে জেলে যেতে হ'য়েছিল কিন্তু—

"কিন্তু সে কথার দরকার কি রাবিয়া?"

তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়াই রাবিয়া বলিল "দরকার আছে —আপনার কাছে আমি চিরদিন অপরাধী হ'য়ে থাকতে পার্ব্ব না, আমার কথা আমায় ব'লতে দিন।"

"তার কোন দরকার নেই রাবিয়া" বলিয়া মহম্মদ তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল "আমি তোমায় কোনদিনই খারাপ ভাবতে পারি না রাবিয়া, তুমি নিশ্চিন্ত হও।" বলিয়াই

হাতের আংটীটা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলি "তোমার প্রভুকে এই আংটীটা দিয়ে বল যে, 'এই মুসাফের বড় বিপদে প'ড়েই এখানে আশ্রয় নিয়েছিল, আর তা'র কাছে অর্থ নাই ব'লে এই আংটিটা দিয়েই ঋণশোধ ক'র্ত্তে চায়।"

রাবিয়া প্রথমে আংটী লইতে ইতস্ততঃ করিল আপত্তি করিল। তারপর সহসা কি মনে হইতেই আংটী লইয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

কিন্তু মহম্মদ প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতেই সে আসিয়া মহম্মদের হাতে একটী ছোট থলি দিয়া বলিল "এ সঙ্গে নিন্।"

থলিতে যে টাকা ছিল—তাহা মহম্মদ বুঝিতেই পারিয়াছিল তাই অত্যন্ত বিস্ময়ে সে বলিয়া উঠিল "সে কি রাবিয়া?"

রাবিয়া তাহার দিকে একবার পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াই চক্ষু নত করিয়া বলিল "মেহেরবান্, গরীব রাবিয়ার এই শেষ দান, একে তুচ্ছ ক'র্ব্বেন না।" বলিয়াই কি জানি কেন সে সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া মহম্মদ একটু ম্লান হাসি হাসিল, তারপর রাবিয়ার দান হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া ধীর

মন্থর গতিতে চলিয়া গেল। কিন্তু এই একটু হাসির মধ্যে সে যে কতখানি শোণিত-অশ্রুপাত করিয়া গেল তাহা বোধ হয় রাবিয়ার অন্তর্যামীই শুধু বুঝিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর পরে মহম্মদ যেদিন আবার দিল্লীতে ফিরিল এবং ফিরিয়াই সোজা মরিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, সেদিন শুধু দিল্লীতেই নহে, সমগ্র পাঠান সাম্রাজ্যে একটা মহাবিপ্লব বাধিয়া গিয়াছিল। সেদিন সম্রাট আলাউদ্দিন হত হইয়াছেন—সেনাপতি কাফুর হত হইয়াছেন—সিংহাসনের ন্যায্য ও অন্যায্য অধিকারী অনেকেই হতাহত হইয়াছেন। আর তাহাদের মধ্যে জীর্ণকুটীরে শুইয়া মরিয়াছে অভাগিনী রাবিয়ার মা। সেদিন সমস্ত দেশের উপর দিয়া বিদ্রোহ ও অশান্তির একটা প্রকাণ্ড ঢেউ বহিয়া যাইতেছিল, আর উত্তেজনায়, অত্যাচারে, ষড়যন্ত্রে পাঠান ভাগ্যলক্ষ্মী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আর মহম্মদের ভিতরেও সেদিন সেইদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যেদিন সংসারের সমস্ত আত্মীয়তার বাহিরে দাঁড়াইয়া,

অপরিচিত জনমণ্ডলীর শুষ্ক সম্ভাষণের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে আর সজীব বলিয়া অনুভব করা যাইতে ছিল না। যেদিন বাল্য কৈশোরের প্রিয় ও অপ্রিয় স্মৃতিগুলাকে শুধু কল্পনা করিয়া নির্জ্জনে, তাহার রসাস্বাদ করিয়া দিন চলিতেছিল না। আর উদ্দেশ্য—বিহীন পথে শুধু আঁখির ইঙ্গিতে ঘুরিয়াও আর তৃপ্তি হইতে ছিলনা।

সেদিন মহম্মদের জীবনে সেইদিন আসিয়াছিল, যেদিন মানুষ গৃহ যত নির্জ্জনই হউক তথাপি সে গৃহ, আর স্বজাতিও স্বদেশ যতই অপ্রিয় হউক, তথাপি সে নিজেরই জাতি নিজেরই দেশ বলিয়া ভাবিতে শিখে। কারণ তাহার এই দশ বৎসরের দীর্ঘ নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে বাহির হইয়া সে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে, সংসারে আর যাহাই থাকুক, স্নেহ নাই, মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি নাই। তাই দিবাবসানের ঘণ্টা যখন বাজিয়া উঠিল, আর তাহার মানস নেত্রে অন্ধকারের কৃষ্ণ পতাকা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তখন সে তাহার অনন্ত পথযাত্রার গতি ফিরাইল, আর ফিরাইল স্বদেশের দিকে যেখানকার স্মৃতি যতই দুঃখময় হউক, তথাপি সে স্বদেশ। মানবের চরম দুঃখের দিনে একমাত্র সেই হৃদয়ে সান্ত্বনা ঢালিয়া দেয়—আর পরম নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরণের সময়, সেই তাহার পরিচিত

অরণ্যানী মাঠ পুষ্পলতা দিয়া আত্মীয়তার আবরণে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে।

কিন্তু স্বদেশের পথে ফিরিতে মরিয়মের অনুরোধটা সহসা মনে পড়িয়া যাইতেই সে দিল্লীতে আসিল এবং আসিয়াই সোজা মরিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

মহম্মদ যখন মরিয়মের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে মুক্ত বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া বোধ হয় মুক্ত আকাশের দিকেই চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল; পশ্চাতে তাহার অবেনী-সংবদ্ধ কৃষ্ণ কেশরাশি আগুল্‌ফ লম্বিত হইয়া মৃদু মন্দ সমীরণে দুলিয়া দুলিয়া স্কন্ধে, অংসে, বাহুতে ছড়াইয়া পড়িতে ছিল, আর তাহার সুরভিত নিঃশ্বাস দ্বার পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া মহম্মদের ললাটস্পর্শ করিতেছিল। পশ্চাৎ হইতে মহম্মদ ডাকিল "মরিয়ম"

"কে মহম্মদ? এসেছ? এত দেরী ক'রে এলে?" বলিয়া মরিয়ম সম্মুখ ফিরিল।

কিন্তু একি? এইকি সেই মরিয়ম? দশ বৎসরের মধ্যে মানুষের এতখানি পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা মহম্মদ এই প্রথম দেখিল। এইমাত্র সে যে মুখ কল্পনা করিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এই দীপ্তিহীন কোটরাগত চক্ষু, পাণ্ডুর অধরে ম্লান হাস্য, দ্বিতীয়ার চন্দ্রের চেয়েও ম্লান, রক্তহীন

বিশুষ্ক মুখ, মুখে নৈরাশ্য ও বিষাদ সবলে স্থান অধিকার করিয়াছে। আর সবার উপরে সেই দেহ, ক্ষীণও নহে, স্থূলও নহে, অথচ উন্নত যৌবন প্রাপ্ত কদলী বৃক্ষের মত, আজ পরিণত যৌবনেই ক্ষীণ যষ্টির আকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া, এই দেহই যে একদিন অপ্সরার রূপ-জ্যোতিঃ মণ্ডিত ছিল, তাহা চক্ষে না দেখিলে মহম্মদ বিশ্বাস করিতেও পারিত না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনেই বলিল বিজন—বাসিনী মরিয়ম প্রাসাদে বন্দী হইয়া শুধু তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই হারায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনী শক্তিরও ক্ষয় করিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মরিয়ম তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল "ব'স মহম্মদ।"

মহম্মদ স্বপ্নোত্থিতের মত শুন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া আসন পরিগ্রহ করিল—করিয়াই বলিয়া উঠিল "মরিয়ম, আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

"বিদায়?" বলিয়া মরিয়ম অত্যন্ত ম্লান হাসি হাসিল—হাসিয়াই বলিল "মহম্মদ, তা'র আগে আমিই তোমার কাছে বিদায় নেব।"

"কেন মরিয়ম! তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছিল?"

অসুখ ? না কিন্তু সে কথা যাক্। মহম্মদ, কাফুরকে আমি বিবাহ করেছিলাম কেন জান ?

কেন মরিয়ম ?

"আমার মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে—আমার সে কার্য্য শেষ হয়েছে।

"তাহলে তুমিই সম্রাটকে—

"না মহম্মদ, আমি এত নীচ হ'তে পারি না—আমি সম্রাটকে বিষ দেওয়ার মত উপদেশ দিতে পারি না। আমি তা'কে সম্মুখ যুদ্ধে বধ কর্ত্তে ইচ্ছা ক'রেছিলাম—কিন্তু কাফুর তাকে গুপ্তহত্যা কর্লে, আমার কার্য্য সিদ্ধ হ'ল বটে, কিন্তু এতে আমারও পরাজয় আছে। সম্রাট মৃত্যুর আগে জানতে পার্লনা যে, কে তাকে হত্যা ক'র্লে।"

"মরিয়ম, এই সম্রাট তোমার পিতা না ?"

"পিতা ? যে এক অসহায়া কিশোরীর হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে সহায় ক'রে তার সর্ব্বনাশ করে, শেষে তাকে কারারুদ্ধ ক'রে হত্যা করে। সে আমার পিতা ? না মহম্মদ, সে মরিয়মের পিতা হ'তে পারে না।"

মহম্মদের বলিবার মত কিছুই ছিল না—সে অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। মরিয়ম আরও বলিয়া যাইতে লাগিল।

"মহম্মদ, আমি জীবনে কোনদিন স্নেহ পাই নাই—আজন্ম আমি মাতৃক্রোড় হ'তে নির্ব্বাসিত হয়েছি, চিরদিন দস্যুদের মাঝে পালিত হ'য়েছি, অরণ্য আমার বাসস্থান ছিল, সেখানকার বাঘ ভালুকের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। সেই অরণ্যের বাহিরে যে সৌন্দর্য্যময় সঙ্গীতময় প্রেমের আলোকময় একটা বিচিত্র সংসার আছে, তা' আমি সেইদিন জানলাম যেদিন তোমাকে প্রথম দেখ্‌লাম। আর তোমার অনুসন্ধানে যেদিন রাজ-পুতানায় এসে উপস্থিত হ'লাম, সেই দিনই আমার হারাণো পরিচয় খুঁজে পেলাম। আর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জীবনের ইতিহাস এক মুহূর্ত্তে বদলে গেল। তোমাকে পাওয়ার সৌভাগ্যই শুধু হারালাম না। সেইদিন থেকে আমি শয়তানী হ'য়ে উঠ্‌লাম।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিল। তারপর আবার বলিতে লাগিল, "তারপর এল' কাফুর, সে বেচারা শুধু সম্রাটকেই বিষ দেয় নাই, আমারই বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে সে অকালে মারা গেল। এখন বাকী আছি আমি—কালের সাক্ষীর মত, শুদ্ধ একটা ঝঙ্কার, এই বেদনার ইতিহাস মানুষের কানে ঢেলে দেবা'র জন্য। কিন্তু তা'ও আর বেশীক্ষণের জন্য নয়। সব গিয়েছে, আজ তুমিও ছেড়ে চ'লে মহম্মদ? বলিয়া সে এমনই সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল যে, মহম্মদ কতকটা

অপ্রস্তুত হইয়াই বলিল "না মরিয়ম, আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।"

"না তোমায় যেতেই হবে, যাও যাও, মহম্মদ, বলিয়া সহসা সে এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, মহম্মদ নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেস্থান ত্যাগ করিতে যাইতেছিল, সহসা মরিয়ম তাহার হাত ধরিয়া বলিল 'না দাঁড়াও, আমি তোমার জন্য অনেক সহ্য করেছি" বলিয়াই তাহাকে এত জোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল যে, মহম্মদ ভয়ে বিস্ময়ে ঘামিয়া উঠিয়া তাহার বাহু বন্ধন মুক্ত করিয়া ফেলিয়া বলিল "একি মরিয়ম?"

মরিয়ম মৃদু হাসিয়া বলিল "ভয় পাচ্ছ' মহম্মদ, একদিন এই মরিয়মের আলিঙ্গন পেলে তুমি ধন্য হ'য়ে যেতে। আর আজ—কিন্তু কোন ভয় নাই বন্ধু, আমি তোমার কোন অনিষ্ট ক'র্ব্বনা। তুমি যে আমার প্রেমের গুরু মহম্মদ," বলিতে বলিতে সে পার্শ্বস্থ শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল—তা'র পর অত্যন্ত ধীর স্বরে বলিল "মহম্মদ, কাছে এস আমার মাথাটা তুলে ধর।"

কিন্তু মহম্মদ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সে অত্যন্ত করুণ স্বরে, বলিল "ভয় নাই মহম্মদ, বিশ্বাস কর বন্ধু. আমি বিষ খেয়েছি।"

তড়িদ্বেগে মহম্মদ তাহার শিয়রে আসিয়া বসিল, বসিয়া বলিল "কি করেছ' মরিয়ম?"

"কি করেছি? কিন্তু সে কথা যাক্ মহম্মদ, তুমি আমায় কখনও ভালবেসেছিলে?"

"সেকথা জানাবার সময় দিলে কৈ মরিয়ম?"

"সময়! না আর সময় নেই—আর প্রয়োজনও নেই - মহম্মদ আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল।"

"কেন এ কাজ ক'র্লে মরিয়ম?" বলিতে বলিতে মহম্মদ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মৃদু হাসিয়া মরিয়ম বলিল "কেন করেছি? কিন্তু সে কথা যাক, মহম্মদ, জান কি? দিনে দিনে আমি কি অতৃপ্তি অনুভব ক'রেছি—কতখানি ব্যথা বুকের মধ্যে পুরে নিয়ে প্রতি নিঃশ্বাসে আমি প্রতিহিংসা ঢেলেছি। কিন্তু যখন প্রতিহিংসা আমার পূর্ণ হ'ল, তখন দেখ্‌লাম যে পরের চেয়ে আমি নিজের অনিষ্টই বেশী করেছি। অল্প অল্প ক'রে যে বিষ ঢেলেছি, শেষে দেখলাম সেই বিষেই আমার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে গেছে। অমৃতের আস্বাদ কখনও পাই নাই, তাই শুধু বিষ নিয়েই আমি ঘর কর্ত্তে পার্লাম না। পার্লাম না, পাছে আবার তোমাদের অনিষ্ট ক'রে বসি। তবু তুমি যদি একটু আগে আস্‌তে মহম্মদ।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহম্মদ বলিল "মরিয়ম, হাকিম ডাকব?"

"হাকিম! নরলোকে এখন তুমিই আমার হাকিম; আর হাকিমে কাজ নাই মহম্মদ—বলিয়াই মহম্মদের দুইহস্ত চাপিয়া ধরিয়া মরিয়ম স্তব্ধ হইল। আর মহম্মদ, সাগ্রহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল "মরিয়ম, এমনই ক'রে আমায় ছেড়ে চ'ল্লে?"

শেষ বারের জন্য মধুর হাসি হাসিয়া মরিয়ম বলিল "ছেড়ে চ'ল্লাম,—কিন্তু জয় করে চ'ল্লাম, আমি যে এই টুকুর জন্যই অপেক্ষা ক'র্চ্ছিনু মহম্মদ?"

মহম্মদ আবার তাহাকে সাগ্রহে চুম্বন করিয়া ডাকিল "মরিয়ম?"

মরিয়ম সে কথার উত্তর না দিয়াই বলিল "মহম্মদ, মনে পড়ে সেই আমাদের প্রথম দিনের সাক্ষাৎ, তুমি মুসাফের আর আমি অরণ্য বালিকা।" বলিয়া তাহার দিকে এমনই ভাবে চাহিল যে, সে চাহনির অর্থ কি, বুঝিতে না বুঝিতেই সহসা সে দৃষ্টি পারদে পরিণত হইল। আর মহম্মদ সেই মৃত দেহটা প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া তাহারই বুকের উপর শুইয়া পড়িল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেদিন দিনান্তে সেখান হইতে বাহির হইয়া শুন্যমনে মহম্মদ আবার পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল, সহসা পশ্চাতের বন হইতে রাবিয়া বাহির হইয়া একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল "মহম্মদ, তোমার আংটি —বলিয়াই বিস্ময়াবিষ্ট মহম্মদের সম্মুখে তাহার সেই বহুদিনকার দেওয়া আংটীটা বাহির করিয়া ধরিল"। এই আংটীটাই মহম্মদ, দশ বৎসর পূর্ব্বে সরাই রক্ষকের ঋণ পরিশোধ করিতে রাবিয়ার হাতে দিয়াছিল। সেইটাই এত অসম্ভবরূপে, এত অপ্রত্যাশিতভাবে, এমন স্থানে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল যে, সদ্যঃমৃত মরিয়মকে পুনর্ব্বার জীবিত হইতে দেখিলে সে বোধ হয় এত বিস্মিত হইত না।

তাহার বিস্ময়-রুদ্ধকণ্ঠ হইতে আপনা আপনিই বাহিরে আসিল "সে কি রাবিয়া?

বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে রাবিয়া বলিল "না এ আংটী আমি রাখতে পারি না—এ আংটী যে দিয়েছিল—

কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতেই মহম্মদ তাহার হাত হইতে আংটীটা কাড়িয়া লইল। এ আংটী যে রোশেনার দান আর ইহাতে তাহার নাম পর্য্যন্ত লেখা আছে, ঘটনা চক্রে পড়িয়া মহম্মদ এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে কথা তাহার মনেই পড়ে নাই। এমন কি এই আংটী দেওয়ার পর এই দশ বৎসরকাল সে কথাটা তাহার আদৌ স্মরণে আসে নাই।

একদিন—সে বহুদিন পূর্ব্বে নির্জ্জনে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রোশেনা যে এই আংটীটা তাহার হাতে পরাইয়া দিয়াছিল—সেদিনকার, তাহার সেই কৈশোর-প্রেমের পবিত্র স্মৃতিটা মহম্মদ একেবারে ভুলে নাই সত্য, কিন্তু হামিদের আবির্ভাবের পর হইতে এতগুলা রহস্যময় ঘটনা তাহার কল্পনাকে কর্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে যে, মহম্মদ নিজের অস্তিত্বকেই ভালরূপে অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সদ্যঃক্ষত হৃদয় লইয়া সে যখন ছুটীর পথে বাহির হইল, ঠিক তখনই এই অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে তাহার পুরাতন ইতিহাসটা এত বড়, এত সত্য হইয়া উঠিল যে, এটা হারাইলে তাহার যে কত বড় ক্ষতি হইত তাহাই ভাবিয়া সে অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল—কিন্তু ইহার এইরূপ

অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনে তাহার যে কোন্ সৌভাগ্যের সূচনা হইল—তাহাও সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না: শুধু হর্ষে, বিষাদে; আশায়, নৈরাশ্যে তাহার অন্তর অন্তরে বসিয়া দোল খাইতে লাগিল।

কিন্তু তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়াই রাবিয়া হাসিয়া বলিল "মনে প'ড়েছে মহম্মদ, তুমি যে বিদেশী বঁধু ভাই, তোমার এ আংটী রেখে আমি কি ক'র্ব্ব" বলিয়াই তাহার স্বাভাবিক উচ্চহাস্যে কানন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অরণ্যের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আর মহম্মদ ভয়ে, বিস্ময়ে, অভাগিনী রাবিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবনায়, বিচলিত হইয়া শিহরিত অন্তরে সে স্থান ত্যাগ করিল। কারণ ঠিক সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কি জানি কেন পারস্য তাহার এত প্রিয় হইয়া উঠিল যে, জন্মাবধি কোনদিন সে জন্ম-ভূমিকে এত ভাল বাসিয়াছে বলিয়া তাহার জানাই ছিল না।

তারপর একদিন রাত্রি অবসানে ধরিত্রীর বক্ষে সেই দিন প্রভাত হইল যেদিন, দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ পরে পারস্যবাসী আবার মহম্মদকে স্বদেশে ফিরিতে দেখিল। সেদিনকার স্বচ্ছ প্রভাত রৌদ্রে, অদৃশ্য বায়ু হিল্লোলে তরঙ্গায়িত শ্যামশষ্পের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে মহম্মদের অন্তরে তাহার সেই কৈশোর জীবনের

স্বচ্ছন্দ দিনগুলা আবার নূতন করিয়া দেখা দিল। আর এত দিনকার বেদনায়, যাতনায়, চিন্তার নিঃশেষে অবসান করিয়া দিল। কিন্তু এই নূতন জীবন লইয়া সেদিন যখন সে তাহার পরিচিত পথে নদীতীরের সরুপথটি ধরিয়া মুরুদ্দিনের বাগান বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সহসা তাহার এই নূতন জীবনের প্রারব্ধ চিন্তাসূত্রই শুধু ছিন্ন হইয়া গেল না, তাহার জন্মার্জ্জিত সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কিছুতেই তাহার আর কোন আস্থাই রহিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কারণ সে দেখিল, দীর্ঘ ষোল বৎসর আগে রোশেনার নিকট হইতে সে যেদিন বিদায় লইয়া গিয়াছিল—সেদিন রোশেনা নদীতীরের যেখানটায় আসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেইখানে সেই রোশেনা দাঁড়াইয়া আছে ; সেই কুমারী ষোড়শী, যৌবনের আগমনে মুকুলিতা লতার মত, আলুলায়িতা কেশা, স্রস্তবেশা, আগ্রহান্বিতা, উৎকণ্ঠিতা, অভিমানিনী। নয়নে তাহার বিষাদ ও বেদনা, ভয় ও নৈরাশ্যে বিগলিত মুক্তাবিন্দু, ঈষদুদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠে ঈষদ্দৃষ্ট দশনে তাহার হীরক কান্তি, যেন তাহারই প্রতীক্ষায় স্থির-যৌবনা প্রতিকৃতির মত দাঁড়াইয়া আছে। আর দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই পার্শ্বে কিয়ৎ দূরে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের রাশি, রোশেনার স্বর্ণবর্ণ চুলের রাশির মত, বায়ু হিল্লোলে ঈষৎ

চঞ্চল. প্রভাত রৌদ্রে ঈষৎ ক্লান্ত, ঈষৎ তপ্ত, অথচ সৌন্দর্য্যে সৌরভে সদ্যঃ বিকশিত পদ্ম পুষ্পের মত।

মহম্মদ বুঝিতে পারিল না যে, সে জীবনের কোন্ পারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ তাহার সজীব বর্ত্তমান, না পরপারের কল্পিত ভবিষ্যৎ—এ তাহার জীবন না মৃত্যু। কারণ সে আজ যাহা সম্মুখে দেখিতেছে তাহা উপন্যাসে সম্ভব হইতে পারে, বাস্তব জীবনে কাহারও হইয়াছে বলিয়া তাহার জানা ছিল না। সে শুধু কম্পিতস্বরে পরপারের মূর্ত্তিকে আহ্বান করিল "রোশেনা।"

মূর্ত্তি একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র—আহ্বান তাহার কর্ণে পৌঁছিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। তারপর মহম্মদ ধীরে ধীরে ভাঙ্গা সেতুটা বহিয়া সে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে গিয়া পুনরায় ডাকিল "রোশেনা।"

বিস্ময়ে বালিকা বলিল "কে আপনি ?"

"আমায় চিন্তে পার্চ্ছ না রোশেনা, মহম্মদকে—একেবারে ভুলে গেছ ?

' ওঃ আপনি আমার মায়ের কথা ব'ল্ছেন" বলিয়া সহর্ষে বালিকা তাহার হাতটা ধরিয়া প্রায় টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল "আসুন, ভিতরে আসুন, তিনি আজও আপনার অপেক্ষা ক'র্চ্ছেন।"

ভিতরে—এক ভগ্ন কুটীরে মৃত্যু শয্যায় রোশেনা শুইয়া ছিল। মহম্মদকে আসিতে দেখিয়াই অধরের পাণ্ডুর অধরে ক্ষীণ হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল! মৃদুস্বরে সে কহিল "এসেছ' মহম্মদ, এস' আমি তোমারই অপেক্ষা ক'র্চ্ছিলাম, আমি জান্তাম তুমি আসবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল "কিন্তু এত দেরী মহম্মদ, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবারও যে অবকাশ পেলাম না।" বলিয়া অতি মৃদু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মহম্মদের বাক্‌শক্তি তখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে রোশেনার মাথার কাছে আসিয়া বসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া গাঢ়স্বরে বলিল "রোশেনা—" বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষু দিয়া একপশলা বৃষ্টি ঝরিয়া গেল।

রোশেনা একবার সজল ম্লান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ডাকিল "মহম্মদ" আর কিছুই বলিতে পারিল না। মহম্মদের হাতটার উপর মাথা রাখিয়া কি জানি কেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল "বড় দেরী ক'রে এলে মহম্মদ" বলিয়াই আবার নিজের মনে বলিয়া যাইতে লাগিল "তুমি যাওয়ার পর থেকে আমি একদিনও সুখী হ'তে পারি নাই মহম্মদ, সেই দিন থেকেই হামিদের উপর আমার বিতৃষ্ণা হ'য়ে গিয়েছিল।

আমিই ভুল ক'রে ছিলাম—কিন্তু তুমি আমায় শুধরে নিলে না কেন মহম্মদ? আমি যে মরুভূমিতে একবিন্দু জল পা'বার আশায় পানীয়ের সমুদ্র ছেড়ে ছুটে ছিলাম, সেটাত' তোমার কাছে অজানিত ছিল না। আমি নারী, আমার ভুলদোষ যে সংশোধন ক'র্ব্বার ভার তোমার, তা' তুমিও কি কপালক্রমে ভুলে গেলে? আমি সেদিন নেশায় মাতাল হ'য়ে উঠেছিলাম, নৈলে আমি তোমায় ভাল বাস্‌তাম মহম্মদ, বড় ভাল বাস্‌তাম" বলিয়াই দুই হাত দিয়া মহম্মদের হাতটা টানিয়া সে জোরে চাপিয়া ধরিল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মহম্মদ উত্তর করিল 'তা' জানি রোশেনা, নৈলে আমি কা'র উপর অভিমান ক'রে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এলাম, কিন্তু কোথাও শান্তি খুঁজে পেলাম না।"

সহসা তাহার আংটিটার উপর হাত পড়িতেই একটু ম্লান হাসিয়া রোশেনা বলিল "এখনও এটাকে রেখেছ মহম্মদ?

"যতদিন বাঁচ্‌ব'—ততদিন রাখব" বলিয়া মহম্মদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

তারপর রোশেনা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল "যাক্ যা' হবার হ'য়েছে—আমার আর সময় নেই যে তা'র জন্য দু'দণ্ড অনুতাপ ক'র্ব্ব। আমি তোমার

প্রেমের প্রতিদান দিতে পারি নাই। কিন্তু আমার মেয়ে রোশেনারা রইল' সে তোমায় সুখী কর্ত্তে পার্ব্বে।"

"না রোশেনা, আর আমায় ও কথা ব'লনা—আমি আর সুখী হ'তে চাই না।"

"কিন্তু তুমি যদি ওকে গ্রহণ ক'র্ত্তে আপত্তি কর, তা হ'লে কা'র কাছে ওকে রেখে যাই মহম্মদ, ও বড় অভাগিনী, জন্মের পর এক বৎসরের মধ্যেই ওর পিতার মৃত্যু হয়। আমি ওকে যত্ন ক'র্ত্তে পারি নাই—তোমাকে পেয়ে ভেবেছিলাম তুমি পার্ব্বে।"

"কিন্তু তা হয় না রোশেনা"—

সহসা রোশেনা অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া বলিয়া উঠিল "না তাই হ'তে হবে মহম্মদ, রোশেনার এই শেষ দান তোমায় গ্রহণ ক'র্ত্তেই হবে—কর্ব্বে না মহম্মদ? বলিয়া তাহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মহম্মদ কোন কথাই বলিল না। বোধ হয় এই পরপারের যাত্রীকে ঠিক যাত্রার মুখেই নিরাশ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না—বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

আর রোশেনা, তাহার কিছু বলিবার মত শক্তি তখন ছিল কি না বলিতে পারি না। সে বোধ হয় তখন অন্তর দিয়া অন্তর

বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর তাহার অন্তর বোধ হয় তখন অন্তর্যামীর চরণোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল। তখন হইতেই সে আর কিছুই বলিল না। আর সেই দিন রাত্রি প্রভাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

মহম্মদের কর্ণে পৃথিবীর যত সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল—সে সকলের এক সঙ্গেই অবসান হইল! রোশেনা, মরিয়ম, রাবিয়া—সেই আলাউদ্দিন দরিয়া, ভারতবর্ষের গিরি প্রান্তর অরন্যানী, সকলের উপরই একটা ছায়াচ্ছন্ন যবনিকা পড়িয়া গেল। আর সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে বাকী রহিল, শুধু বির্জনবালা রাজনন্দিনী মরিয়মের শেষ স্মৃতি। পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত সমস্ত ঝঙ্কার ছাপাইয়া সেই কম কণ্ঠের শেষ মধুময় বাণী "তুমি মুসাফের, আর আমি অরণ্য বালিকা।"